রক্ত-রাখী

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মডার্ণ লিটারেচার
(ইণ্ডিয়া)

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৫২

মডার্ণ লিটারেচার (ইণ্ডিয়া) এর পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল দ্বারা
প্রকাশিত ও কয়োড়ী প্রেস (৩, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা) এর
পক্ষে শ্রীবিভূতিভূষণ কয়োড়ী কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু

রক্ত-রাখী

দুর্ভিক্ষের রকমফেরটা আর রকমারি করে বর্ণনা করব না, কারণ যাঁরা বোঝবার তাঁরা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। যাঁদের ওপারে পাড়ি মারতে হ'ল তাঁরাও তাঁদের শেষ যাত্রার অপরূপ ধরণটির সাহায্যে—যাঁরা বেঁচে রইলেন তাদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। কিশোরী, একটি মেয়ে, এই ধকল সাম্‌লাল কি সাম্‌লাল না এইটিই বলবার কথা।

কিশোরী থাকে একটি গাঁয়ে। মা আছেন, ছোট ভাই আছে। বাপ নেই, অন্য অভিভাবক নেই। একখানা ছোট খাটো আটচালা আছে গাঁয়ে—জমিজমা কিছু নেই। অবিবাহিতা মেয়ে, নাবালক ছেলে আর বিধবা মা, তিনটিই সহানুভূতির পাত্র। এদের তিনজনের দুঃখের পরিমাণটা যে পরিমাণ সহানুভূতি আদায় করতে পারে গ্রামবাসিদের কাছ থেকে তারই ওপর চলত এদের দিন। কেউ শাকটা, কেউ মুলোটা, কেউ এক কুন্‌কে চাল, কারুর চালে কুম্‌ড়ো হয়েছে তারই এক কুঁচি, এই রকম চলে আসছিল গত দুটো বছর। এ বছর আর চলল না। কারণ দুর্ভিক্ষ। ভিক্ষে মেলে না।

২

গ্রাম ছেড়ে তাই বেরোতে হয়। নুয়ে-পড়া আটচালাটার দিকে চেয়ে কিশোরীর মা তারাকিংকরীর চোখে জল এসে পড়ে! কিশোরীর ছোট ভাই সুবল কচি আমপাতা চিবোয়। গ্রামের লোক কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে কে জানে। ঘটা করে বিদায় দেবে কে যে বিদায় নেবে এরা? তবু উঠোনে নাকি তুলসী গাছটি ছিল অনেকদিনের, তাই।

যাই হোক্ এরা এগোল। মাঠের পথ ধরে অনেকখানি চলে সন্ধ্যাবেলায় এলো আর একটি গ্রামে। রেলস্টেশনে যাবার পথে পড়ে এই গ্রাম। এই গ্রামে তারাকিংকরীর দেওর বাস করেন, কিশোরী সুবলের কাকা। যদি আশ্রয় মেলে তাই তারাকিংকরী হাজির হ'লেন তাঁর দেওরের বাড়িতে।

দেওর হরেন মাথায় হাত দিলেন, কপালে যাকে বলে করাঘাত তাই করলেন, জানালেন তিনি অক্ষম, নিরুপায়।

দেওর-বৌ মন্দাকিনী বললেন, আপনি খেতে ঠাঁই পাই না, শংকরাকে ডাক্! বলি সকাল-বিকেল ছেলেদের দুটি মুড়ি দিতে পারিনে, আর উনি এলেন দুটি শত্তুর নিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপতে!

তারাকিংকরী বললেন, বৌ, আমি মরলে ক্ষতি নেই। ছেলেটা নাবালক হ'লেও পুরুষ। কিন্তু কিশোরী যে আইবুড়ো মেয়ে। ও দুমুঠো ভাত পাবে কি করে?

মন্দাকিনী জবাব দিলেন, বুড়ো রুক্মিনী মাইতি চাল বেচে পয়সা করেছে। সোমত্ত মেয়েরা গিয়ে মুচকি হেঁসে দাঁড়ালে সে সংসারের আর চালের ভাবনা ভাবতে হয় না। দাও না কিশোরীকে পাঠিয়ে।

—তুমি বলতে পারলে ছোট বৌ, তাই শুনতেও আমি পারলাম! কিন্তু আর কখনও এ রকম বোলো না। হাজার হোক্ আমি গর্ভে ধরলেও কিশোরী তোমারও তো মেয়ে।

—আমার সোয়ামী যদি তোমার সোয়ামীর মতো জীবনভোর আর কিছু না করে শুধু বাউল গেয়ে বেড়াত আর আমার যদি ঐ রকম একটা সোমত্ত মেয়ে থাকত, তাহ'লে তুমি জ্ঞাত-কুটুম— তুমি না শোনালেও আর কারুর মুখে আমাকে এ রকম কথাই শুনতে হ'ত। দিদি, হিংসে করে কি করবে? ভগবান্ আমাকে বাঁচিয়েছেন, তোমাকে মেরেছেন। আপন আপন কর্মফল তোলা ছিল। তাঁরই বা কি অপরাধ বলো?

কিশোরী বলল, না। ভগবানের অপরাধ হবে কেন? চলো মা, আমরা যাই।

—ও কিশোরী, ভাঁটিখানার কাছে গেলে এখন মাইতি বুড়োকে পাবি।

—বাজারে যদি বেরোতে হয় খুড়িমা তো বাজার গরম করেই বেরোব। তোমার ঐ মাইতি বুড়োর কাছে যাব না। চলো মা।

মায়ের আর সুবলের হাত ধরে কিশোরী এগোল।

—শুনলে গো, তোমার ভাইঝির কথা! মন্দাকিনী চেঁচিয়ে উঠলেন। বলে কিনা, আমার মাইতি বুড়ো! ইংরিজি পাঠশালায় পড়ে মেয়ে বিঙ্গি হয়েছেন!

—ও তো জানা কথা ছোটবৌ! নইলে দাদার ক্ষুদ কুঁড়ো ওরা—সাধে কি খবর নিই না! দাদা মানুষ করেছেন আমাকে সে কি ভুলেছি? কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলেও কি এম্‌নি করেই এদের শাসিত করতেন না? নিশ্চয় করতেন।

কিন্তু শাসিত হবার জন্যে তারাকিংকরী, কিশোরী বা সুবল কেউই উঠোনে দাঁড়ায়নি। কর্তব্যপরায়ণ কণিষ্ঠের কপচানি সুরু হবার আগেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল।

৩

মাটিন কোম্পানির রেল স্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে রাত কাটানো আর বনে রাত কাটানো আগেকার দিনে এক কথা ছিল। কিন্তু আজকালকার মহামারী আর অন্নকষ্টের দৌলতে অভুক্তদের একত্র হওয়ার সুযোগটা প্রয়োজনের তাগাদায় বেড়ে গেছে। স্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে এসে তারাকিংকরী দেখলেন যে তিনি একা নন্—তাঁর কুমারী মেয়েও একা কুমারী মেয়ে নয়—তাঁর নাবালক ছেলেটিও একা নাবালক ছেলে নয়। অদৃশ্য হাতের গড়া এই মহাদুর্ভিক্ষ মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্তদের অবলীলাক্রমে আতুরের

পর্যায়ে এনে ফেলেছে। নিঃস্ব অনেকেই, ভিক্ষামাত্র-সম্বল অনেকেই, ভিক্ষার আশায় মহানগরীর পথে যাত্রী অনেকেই। এই অনেকের দলে ভিড়ে রাত কাটল, ভোর হ'ল, চড়চড়ে রোদও উঠল। সুবলের সম্বল আমগাছের পাতা—আরও অনেক ছেলের যা' সম্বল। তারাকিংকরী আর কিশোরীর ঢালাও ব্যবস্থা—পুকুরের জল আঁজলা করে খাও যত পারো।

ট্রেন যখন এলো তখন সেটি একটি দেখবার জিনিস। বাদুড়ঝোলা হয়ে লোক আসছে। ট্রেনের ছাদে লোক আসছে। টিকিট তাদের মধ্যে পনেরো আনার নেই। টিকিট কেনবার ক্ষমতা যে তাদের নেই তা' তাদের হাড়বেরকরা চেহারা আর শতচ্ছিন্ন বস্ত্র থেকেই প্রকট হচ্ছে। তাই রেল কর্মচারীরা আর টিকিট চেয়ে কষ্ট স্বীকার করছেন না। বিনা টিকিটের যাত্রীদের ওপর এলোপাথাড়ি জুতো লাথি চালাচ্ছেন!

অবিশ্যি ভারতবর্ষের লোকদের, বিশেষ অন্নহীন লোকদের, লাথি জুতো খাওয়ার অভ্যেসটা এখনও অটুট আছে। পা-টা একটু ভালো জাতের হ'লেই হ'ল। বিশেষ সেই পা যদি বেরিয়ে থাকে পেন্টুলনের মধ্যে থেকে আর সেই পায়ে যদি থাকে একটি বুট বা নিদেন একটি শু, তো ভারতীয় আত্মা কৃতার্থ হয়ে যায়। 'অমন মিষ্টি লাথি আর খাই নি' এই কথাটি ভারতীয় আত্মা বলে তার পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মা খবরটি পেয়ে নিমিলিত নয়নেই একটু ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু এরা, অন্নের আশায় যারা গ্রাম ছেড়ে সহরে যাবার

জন্যে মরীয়া—এরা নেহাৎ-ই মরীয়া। তাই লাথি এরা খেল কিন্তু রেলের কাম্‌রাতে প্রাণপণে টিঁকে রইল। এই বিনা টিকিটের যাত্রীর পনেরো আনাই ট্রেনের মধ্যে থেকে গেল। রেলকর্মচারীরা লাথিটা-আস্‌টা চালিয়েই নিজেদের কর্তব্য শেষ করলেন।

প্রবাদ আছে, যে এ লাইনে একজন গার্ড নাকি এই রকম কণ্ট্রোলের যাত্রীদের লাথি মারতে মারতে তাদের দুঃখে ভ্যাক্‌ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু অপরাপর বিনা টিকিটের যাত্রীরা এ কথাটা বিশ্বাস করে না। নেহাৎ রসিকতা বলেই নেয়।

মহানগরীর এক প্রান্তে যখন এই মন্থরগামী ট্রেনটা এসে দাঁড়ায় তখন একদল সত্যিকারের সর্বহারা সেই ট্রেনের বুক থেকে নেমে সহরের কঠিন পিচের রাস্তায় পা দেয়। এই রকম একটা দলের সঙ্গেই তারাকিংকরী এসে পৌঁছোলেন কলকাতায়—সঙ্গে সুবল আর কুমারী মেয়ে কিশোরী।

৪

বিনাটিকিটের এই ছোট্ট যাত্রীর দল, বিনাপুঁজির এই মুসাফির ক’টি, এই বিরাট কলকাতা সহরে খাবার দেখল অনেক রকম—কাঁচের ঢাকার মধ্যে দিয়ে দোকানে রয়েছে৲

দেখল—কিন্তু আহার করাটা তাদের ভাগ্যে আর হয়ে উঠল না, কারণ কেনবার সামর্থ্য আর নেই তাদের।

ভাবগতিক দেখে সুবল বুঝল মাকে দিদিকে ক্ষিদের কথা বলে লাভ নেই। যদি সে নিজে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে তবেই হবে। অবিশ্যি চুরি করার কথাটা সে আগে কোনওদিন খুব গভীর ভাবে ভাবে নি—কারণ, সে বাড়ির খাবার খেত চুরি করে, অথবা পরের বাগানের ফলটা পাকড়টা—পাহারাটা কোথাও কড়া ছিল না।

কিন্তু কলকাতা সহরে খাবারের দোকানে পাহারা আজকাল বেশ কড়া। দোকানে আজকাল একজন বিশেষ কর্মচারীই বোধ হয় রাখা হয়েছে যার এক মাত্র কাজ ভিখিরী বিতাড়ন করা। যাই হোক্ সুবল মরীয়া হয়ে কিছু একটা করবে ঠিক্ করছে, এমন সময় দেখল তারই মতো একটি ছেলে খাবার চুরি করবার চেষ্টা করল, ধরা পড়ল এবং বেদম মার খেল।

পেটে খাবার কিছু না থাকা সত্ত্বেও সুবলের বমি এলো। নেহাৎই পিত্তিবমি। তারাকিংকরী কাণ্ডকারখানা দেখে ভয় পেয়ে বললেন, বাবা, সুবল, খেতে পাস্ আর না পাস্, চুরি করে খেতে যাস্নি বাবা। এখানে তোর ক্ষিদের কথা কেউ বুঝবে না। চোরের শাসন করতে গিয়ে প্রাণটাই হয়তো বের করে দেবে।

কিশোরী সেই অচেনা ছেলেটির মার খাওয়ার বহর দেখছিল। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বলল, বাবুরা, মার

তো আপনাদের হাতে এ অনেক খেল। কিন্তু যা খাবার জন্যে এ চুরি করেছিল তা' তো এখনও এর পেটে যায় নি। ওকে এবার কিছু খেতে দিন্। নইলে ও তো এইবার মরে যাবে।

'মরে যাবে' কথাটা লোকজনদের ভয় পাইয়ে দিল। 'ব্যস্' 'ব্যস্', 'যেতে দাও' এ রকম কথাও শোনা গেল। কানে এলো, কে একজন বলছে, বেড়ে ল্যাটটি তো! একজন একটা সিকি ছুঁড়ে ফেলে দিল মার-খাওয়া ছেলেটির দিকে। ছেলেটি বড় বড় চোখ করে চাইল কিশোরীর দিকে—তার চোখে জল। কিশোরী চলে আসছে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, ও তোমার কেউ হয় না কি?

—নিকট রক্তের সম্বন্ধ কিছু নেই। কিন্তু কেউ হ না একথা বলি কি করে? কিশোরী জবাব দিল।

—কি রকম?

—ও আপনারও যা আমারও তা'। আমাদেরই দেশের ছেলে।

—কথার বহর দেখেছ! বলে উঠল একজন।

কিশোরী কোন জবাব না দিয়ে ফিরে এলো। বলল, চলো মা। সুবলকে বলল, চল্।

৫

লঙ্গরখানা বা ফ্রী কিচেন্-এর তখনও উদ্ভব হয়নি। কোথাও কোথাও বৃদ্ধেরা প্রৌঢ়েরা এর বাড়ির দুটো পান্তাভাত আর ওর বাড়ির খানিকটা গরম ফ্যান্ এক করে 'একটু ফ্যান্ দাও মা' প্রার্থিনী, যার মধ্যে মেয়ে শিশু এবং বৃদ্ধদের সংখ্যাই অধিক, তাদের খাওয়াবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের এই করুণ প্রয়াস দুঃখীদের দুঃখমোচন বিশেষ হয়তো করতে পারে নি। কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখের ব্যাপকতায় অল্পবিত্তদের সহানুভূতি যখন ক্ষয় পেতে বসেছে এবং অর্থ উপার্জনের নারকীয় নেশায় ধনীরা যখন পুরোপুরি অমানুষ হয়ে উঠেছেন তখন এই নেহাৎই বৈষ্ণবধর্মী নির্বিরোধী জনকয়েক প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের প্রচেষ্টা অনেকের মনে হাতুড়ির ঘা মেরেছিল—তাই বোধ হয় হয়েছিল সরকারী এবং বেসরকারী বহু লঙ্গরখানা।

কিন্তু তারাকিংকরী বা কিশোরী এই লঙ্গরখানার অস্তিত্বের সুযোগটা পান্‌নি। অন্নভিক্ষাটা তখন ব্যাপকভাবে সহরের ওপর ছড়িয়ে পড়লেও ভিক্ষাদান সম্বন্ধে নাগরিক চেতনা তখনও রূপ নেয় নি। তখন নিঃস্বদেরও চাল কিনতে হ'ত কণ্ট্রোলে লাইন দিয়ে। ছেলের হাত ধরে তারাকিংকরী এই রকমই একটা কণ্ট্রোলের দোকানের সাম্‌নে লাইন দিলেন। কিন্তু কণ্ট্রোলের চাল কিনতেও তো পয়সা লাগে, এবং পয়সা তাদের একেবারেই নেই। কাজেই কিশোরী বেরোল পয়সা সংগ্রহ

করতে। তারাকিংকরী সুবলকে নিয়ে অভুক্ত পড়ে রইলেন সেই কণ্ট্রোলের দোকানের সাম্‌নে। সকালবেলায় দোকান খুলবে, জায়গাটা না বেহাত হয়ে যায়!

৬

নেহাৎ গল্পই যদি লিখতাম তো গৃহলক্ষ্মী কুলবধূ আর অনূঢ়া কিশোরীদের বলতাম, বই বন্ধ করুন। এখন থেকে আর পড়বেন না বইখানা। কিন্তু যা লিখছি সেটা কি শুধু গল্প?

ঈশ্বর করুন্, যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশবাসীদের কাছে এ কাহিনী যেন গল্প হয়েই থাকে—যেমন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গল্প ছিল আমাদের কাছে। কিন্তু কিশোরীর কাছে ১৩৫০ সালটা গল্প ছিল না। অভিভাবকহীন সহায়সম্বলহীন কপর্দক-হীন এই মেয়েটি হঠাৎ ঠেক্ খেয়ে এসে দাঁড়াল মহানগরী কলকাতার রাজপথে। নিজে সে একদিন অভুক্ত। তার মা, তার ছোট ভাই অভুক্ত, কণ্ট্রোলের লাইনে রাত কাটাতে প্রস্তুত হয়ে পড়ে আছে, আর সেই চাল কেন্‌বার পয়সা যোগাড় করতে হবে কিশোরীকে—সময় একটা রাত।

ভিক্ষের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড্ড বেশি। হাত পেতে সুবিধা হবে না, কিশোরী বুঝল। অথচ পয়সা চাই।

খুড়িমার কথা তার মনে পড়ল। নিজে দম্ভ করে সে বলে

এসেছিল, বাজারে যদি বেরোতে হয় খুড়ীমা তো বাজার গরম করেই বেরোব।

কিন্তু আঁধারের এই সহরে কোথায় তার ঔজ্জ্বল্য! তার অভুক্ত দেহের শীর্ণতায়, মলিন বস্ত্রের অপটু আচ্ছাদনে, তৈলহীন কেশের রুক্ষতায় কোথায় সে আকর্ষণ, যা' লুব্ধ করবে কামনাতুর পুরুষকে, যা অর্থ এনে দেবে? পথের পর পথ অতিক্রম করে কিশোরী চলল। মন তার চিন্তায় আচ্ছন্ন। সে দুঃখে পড়েছে বলে নয়, সে নিরুপায় ব'লে নয়। তার আজীবনের সংস্কার তাকে সংযমের মধ্যে আজও আটকে রাখছে, এই উপলব্ধির জন্যে। নারীর আহ্বানের ব্যঞ্জনা যে তার দিক্ থেকে প্রকট হ'তে পারে এ সম্বন্ধে যখন সে হতাশ হয়েছে তখন ঘটল ছোট্ট একটি ঘটনা।

একজন পুরুষ নেহাৎ-ই তার কাছাকাছি এসে তার শরীর স্পর্শ করল, ধাক্কা দিল, মৃদু। কিশোরী বালিকা নয়। বুঝল।

লোকটি বলল, লেগেছে?

না।

কোথায় থাকো?

কোথাও না।

নতুন এসেছ বুঝি এখানে?

হ্যাঁ।

খেয়েছ?

না।

কেন ?

পয়সা নেই।

খাবে ?

পয়সা কৈ ?

আমি দোব। লোকটি লোলুপ দৃষ্টিতে চাইল কিশোরীর দিকে।

অম্‌নি ?

অম্‌নি কি কেউ কাউকে কিছু দেয় ?

তা' দেয় না বটে, কিশোরী বলল। কিন্তু আমার কি দেবার আছে ?

সে আমি জানি, লোকটি বলল। এসো আমার সঙ্গে।

পথের গভীর অন্ধকারের মধ্যে কিশোরী হেঁটে চলল লোকটির পাশে পাশে।

কোথায় যাওয়া যায় বলো তো ?

কি জানি !

তোমার ডেরা নেই একটা' ?

না।

তা'হলে পথে পথেই...

কিশোরী চম্‌কে উঠল। কুমারী জীবনের চরম অভিজ্ঞতা যা জীবনের রূপ আর সুর দুই বদলে দেয়, তা কাঞ্চনমূল্যে বিকিয়ে যাবে অপরিচিত দুর্বৃত্তের কাছে পথের অন্ধকারে ! মানুষ কি আজ কুকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চলেছে ?

ঠুং ঠুং ঠুং রিক্সা চলেছে। বিনোদের নেশা করাটা যদিও পেশা নয়, তবু অনেক পেশাদার নেশা-করিয়ের চেয়েও নেশার রেশকে ও পিযে রাখতে পারে—ওর মাথা থাকে সাফ, পা টলে, কম। তবু যে এই রিক্সা করা, এটা নেহাৎ-ই হাওয়া খাবার জন্যে, আর বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেশ খানিকটা সময় কেটে যায় এই জন্যে। রিক্সার ওপরে বিনোদ ঝিমিয়ে চলছিল। গান গাইছিল না ও নেহাৎ গান জানে না বলেই।

হঠাৎ পুরুষকণ্ঠে একটা আর্ত চীৎকার শুনে বিনোদের নেশা গেল ছুটে। লাফিয়ে নামল রিক্সা থেকে।

—মেয়ে তো নয়, বিচ্ছু—একেবারে রক্ত বের করে দিয়েছে! দেখি, আজ কে তোকে রক্ষে করে!

—কি হয়েছে মশাই? বলে বিনোদ অকুস্থলে পৌঁছল। একটা বিফল দেওয়ালের প্রবেশ পথেই ঘটছে ব্যাপারটা!

বিনোদকে দেখে পুরুষটির পুরুষকণ্ঠ নেমে এলো। বলল, হাত কাম্‌ড়ে দিয়েছে মশাই!

কে?

এই মেয়েটি!—পুরুষটি একটি মেয়েকে দেখিয়ে দিল।

বিনোদ দেখল মেয়েটি জড়সড় মোটেই নয়—সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

—তা' এত রাত্রে এই মেয়েটি এইখানে আপনার হাতটি কামড়ালেন কেন ?

—তা' এই মেয়েটিকেই জিজ্ঞাসা করুন্—বলেই সেই পুরুষটি হাঁটতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, তারপর দৌড়ে গলিটি পেরিয়ে অপর এক রাস্তা ধরলেন।

—ও মশাই, মশাই, ও মশাই—বিনোদ ডাকল। কিন্তু মশাইএর সাড়া দেবার বা ফিরে আসবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

—উনি চলে গেলেন যে! বিনোদ বলল মেয়েটাকে!

মেয়েটি শুধু বলল, হুঁ!

উনি আপনার কে হ'ন ?

তাতে আপনার দরকার ?

ভদ্রলোকের হাত কাম্ড়ে দিলেন রাত দুপুরে, তাই জিজ্ঞেস্ করছি।

—যে হাত শুধু অসম্মান করে কিন্তু তার দাম দেয় না —সে হাত আমরা কামড়েই থাকি! আমরা ডাকিনী যোগিনী নাগিনী কত কি! আমরা যে মেয়ে!

—ওঃ, আপনি একজন মেয়ে। আপনি একজন পুরুষের হাত কাম্ড়েছেন। সেই হাত আপনাকে অসম্মান করতে এগিয়ে এসেছে অথচ আপনার সম্মান হারাবার দাম আপনাকে দেয়নি—এই জন্যে।

হ্যাঁ।

—ধরুন্ কোনও হাত যদি আপনাকে মূল্য দেয় তাহ'লে সেই হাতের কাছ থেকে অসম্মান কি আপনি নেবেন ? না, শুধু কাম্‌ড়েই দেবেন ?

একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

তাহ'লে—মদটদ খেয়েও সামান্য কিছু পুঁজি এখনও আছে, সেটা লড়িয়ে দিতাম ।

কৈ—দিন্ !

ওঃ বাবা ! আপনি তো নাগিনী নন্—কালনাগিনী ! এখানে একলা ফেলে গেলে এ পাড়ার কোনও সন্থ-রোজগার-করা এ-আর-পি'র ছোঁড়ার মাথাটি চিবিয়ে খাবেন্ তো ! তার চেয়ে আমার ওপরই ভর করুন্। উঠুন্ রিক্সাতে। কোন্ দিকে যাবে বলে দিন্ :

কোন্ দিকে আবার ?

কেন ? আপনার বাড়ির দিকে।

বাড়ি আমার নেই।

আস্তানা তো একটা আছে ?

তাও নেই।

তাহ'লে, আচ্ছা তাহলে আমার বাড়িতেই। তা' মূল্যটা কি অগ্রিম দেয় ?

পরে দিলেও চলবে।

এতখানি বিশ্বাস—এক নজরে ?

বিশ্বাস করেছি বলে যদি আপনার অবিশ্বাস হয় তো ছেড়ে চলে যান্ আগে।

না না। বাড়া ভাত আমি ছাড়ি না। ওঠো—ওঠো রিক্সাতে!

মেয়েটি রিক্সাতে উঠল। রিক্সা চলল। উঠে বসে বিনোদ বলল, তোমার নাম কি?

কিশোরী।

৮

একটি গেট্ওলা একতলা বাড়ির সাম্নে এসে রিক্সা থামল।

বিনোদ নামল রিক্সা থেকে। রিক্সাওলা ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

পাঁড়ে—পাঁড়ে—বিনোদ ডাকল।

দরওয়ান এসে দরজা খুলে দিল।

বিনোদের পেছনে কিশোরী যখন বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল তখন দরওয়ান্ হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে রইল না। ফটক বন্ধ করে নিজের দেউড়িতে ঢুকল।

কোলাপ্সিবল্ গেট্ ঠেলে বিনোদ ঢুকল ছোট্ট বারান্দাটিতে। আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল একটি চাকর দাঁড়িয়ে।

—খাবারদাবার কিছু আছে না কি রে মধু? বিনোদ বলল।

আছে।

দু'জনের হবে?

হ্যাঁ।

বাঁ দিকে বসবার ঘর। বিনোদ ঢুকল, পেছনে কিশোরী।

—এত রাত্তিরে চান্ করবে কি?

না।

বোসো তাহ'লে। আমি নেয়ে আসি।

বিনোদ চলে গেল। কিশোরী বসল একটি সোফার ওপর।

পরিষ্কার আসবাবপত্র এবং চমৎকারভাবে সাজানো ঘরটির মধ্যে নিজেকে কিশোরীর বড়ই বেমানান্ মনে হ'ল। এ রকম একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে সে কেন এসে পড়েছে এই কথা ভাবতে গিয়ে তার বুকে কান্না ঠেলে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল, তার মা তার ভাই পথের ওপর কন্ট্রোলের লাইনে জায়গা দখল করে রাত কাটাচ্ছে। তাদের রাত্রি যাপন তো কিশোরীর রাত্রি যাপনের চেয়ে কম অদ্ভুত নয়। কিশোরীর শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে টুকিটাকি জিনিসপত্র অনেক রয়েছে। কিন্তু ঘরের মালিকের রুচি বড় চমৎকার। দোয়াতদান, কাগজ-চাপা থেকে দেয়ালের ছবি পর্যন্ত নগ্ন আর অর্ধনগ্ন নারীমূর্তির আবির্ভাবে বিপন্ন। কিশোরী ভাবল, এই ভদ্রলোক যা করছেন তা এঁর পক্ষে করা সম্ভব। দরওয়ান বা চাকর কেউই তো

তার আগমনে আশ্চর্য হ'ল না। বোধ হয় তার মতো কারুর না কারুর আবির্ভাবে এ-বাড়ির রাত্রি চির-উজ্জ্বল।

একটা পায়জামা, হাতকাটা গেঞ্জি পরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বিনোদ ঘরে ঢুকল।

—ছবি দেখছ ?

কিশোরী জবাব দিল না।

এ সব ছবি দেখে অন্ততঃ তোমার তো লজ্জা পাওয়া উচিত নয়।

লজ্জা পেয়েছি বলে কি মনে হচ্ছে ?

তবে কি আশা করো যে এই সব ছবিগুলোর সাম্‌নে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি লজ্জা পাব ?

সে রকম বোকার মতো আশা আমি করি না।

হুঁ।

মাথা মুছে তোয়ালেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিনোদ আয়নার সাম্‌নে গিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

—আগে তো কখনও তোমাকে দেখিনি ?

আপনার কথাটি কি একটি প্রশ্ন ?

যদি তাই হয় ?

তাহ'লে বলব, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক—আপনার অধিকারের গণ্ডির মধ্যে নয়।

হুঁ।

বিনোদ [illegible] বলল, চলো।

৯

বিনোদের সঙ্গে কিশোরী গেল পাশের একটি ঘরে। টেবিলের চারপাশে চেয়ার সাজানো। খাবার ঘর। মধু তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে। দুজনে বসতে দুজনকেই পরিবেশন করতে লাগল। সাদা প্লেটের ওপর তারই মতো সাদা ধবধবে সরু চালের ভাত, চারপাশে সাজানো প্লেটে নানা রকমের তরকারি। কিশোরী চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

বিনোদ খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কিশোরী চুপচাপ বসে।

কয়েকগ্রাস খাবার পরই বিনোদের নজর পড়ল।

—খাচ্ছ না যে।

খাব বলে তো এখানে আসি নি।

হুঁ।

বিনোদ আবার খেতে লাগল। কিশোরী দেয়ালের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

তুই যা, মধু—দরকার হ'লে ডাকব।

মধু চলে গেল।

—ক্ষিধে নেই বুঝি? বিনোদ জিজ্ঞাসা করল।

যথেষ্টই আছে।

তাহ'লে খাচ্ছ না যে!

এই প্রশ্নটাও আপনার অধিকারের বাইরে। কিশোরী ধীরে ধীরে জবাব দিল।

চামচেটা মুখে তুলতে যাচ্ছিল বিনোদ, নামিয়ে রাখল। কিশোরীর মুখের দিকে চাইল। বিনোদের দৃষ্টিটা এড়াবার জন্যে কিশোরী দেওয়ালের দিকে দেখল। বিনোদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—পান দে, মধু—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মধু এসে এক প্লেট পান রাখল টেবিলের ওপর।

হাত ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বিনোদ ঘরে ঢুকল। প্লেট থেকে পান নিল।

—পান খাবে না কি ?

না।

কিশোরী উঠে দাঁড়াল।

অফিস থেকে টেলিফোন এসেছিল বাবু—মধু বলল।

কাল সকালে শুনব। তোরা এখন ঘুমুগে যা।

মধু থেমে গেল।

বিনোদ ডাকল, চলো।

কিশোরী এগোল।

১০

এইবার শোবার ঘর। দরজার সাম্‌নেই একটু জায়গা ছেড়ে একটি হাফ্‌ স্ক্রীন্‌। পাশে হ্যাট-স্ট্যাণ্ড্‌। পাশেই সুইচ্‌। বিনোদ আলো জ্বালল।

পর্দার পাশ দিয়ে বিনোদ ঢুকল, পেছনে কিশোরী।

ঘরটি আগাগোড়া কার্পেট-মোড়া। চারদিকের দেওয়াল রংকরা—কোথাও ছবি নেই একখানাও। ঘরের সঙ্গেই বাথ্‌রুম্‌। তার দরজা খোলা। একজনের শোবার মতো একটি খাট ঘরের মাঝখানে।

কিশোরী চারদিকে চেয়ে দেখল। শেষকালে নজর পড়ল খাটটার দিকে।

বিনোদ বলল, ওঃ।

বিনোদ চলে গেল দেয়ালের দিকে। দুটি কড়া ধরে টানল। একটি ডিভ্যান্‌ বেরিয়ে এলো। ঘরের মাঝখানে ফিরে এলো। খাটটিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ডিভ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দিল। দুটিই সমান উঁচু।

বিনোদ ফিরে এলো কিশোরীর দিকে। বলল, অসুবিধে কিছুই নেই।

কিশোরী মাটির দিকে চেয়ে রইল।

বিনোদ বেরিয়ে গেল।

কিশোরী মাটির দিকে চেয়েই রইল। মুখ তুলতে

পারল না। ডিভ্যান্ ও খাটটিতে মিলে যে শয্যা রচিত হয়েছে তা নজরে পড়বে।

শুনল, বিনোদ ডাকছে, এদিকে এসো।

কিশোরী গিয়ে দাঁড়াল হাফ্‌ স্ক্রীন্‌এর কাছে—দরজার সামনে। দেখল, বিনোদ কতকগুলো নোট, দশ টাকার, হ্যাট্ স্ট্যাণ্ডের র‍্যাকের ওপর রাখছে।

—যাদের চিনি জানি তুমি ঠিক্ তাদের মতো নও। তাই তোমার দাম আমি ঠিক করতে পারলাম না। এখানে যা রেখে যাচ্ছি দেখ। যদি এর মধ্যে তোমার দাম কুলিয়ে যায় তো ভালো। নইলে আজ আর নয়। কারণ, ধারে কারবার আমি করি না। আর একটা কথা। নাচের সময় ঘোমটা আমার ভালো লাগে না। লজ্জা যা নিবারণ করে তার গতি এই হাফ্‌ স্ক্রীনের এপাশেই যেন থেমে যায়। আবরণ সৌন্দর্য বাড়ায় তেমন ধারণা আমার নেই, তা আশা করি আমার ওঘরের ছবিগুলো দেখেই বুঝতে পেরেছ। আলো জ্বলছে। আমি চললাম। যতক্ষণ আলো জ্বল্‌বে ততক্ষণ বুঝব তুমি মনস্থির করতে পারো নি। আমি আসব না।

বিনোদ চলে গেল।

কিশোরী দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে তার চোখ পড়ল হ্যাট্‌-স্ট্যাণ্ডের র‍্যাকের ওপর ছড়ানো নোটগুলোর ওপর। মুখ তুলতেই নজর পড়ল আয়নায় তার নিজের ছায়ার ওপর। সে রোগা হয়েছে, সত্যিই সে রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু শুধু

কি সে ? আয়নায় তার মুখের ছায়ার ওপর যেন আস্তে আস্তে ফুটে উঠল তার মায়ের মুখ, তার ভায়ের মুখ—এই রকম কৃশ আর অসহায়—কেমন অদ্ভুত লাগল। তারা এখনও কণ্ট্রোলের লাইনের সামনে জায়গা দখল করে বসে আছে। কিশোরীর মাথা ঘুরে উঠল। সে মাথাটা নাড়ল। আয়নার ছবিটা 'মিলিয়ে গেল। শুধু তারই মুখের ছায়া! চোখ একটু নিচে নামল। হ্যাট্-র‍্যাকের ওপর ছড়ানো নোটগুলো। ধীরে ধীরে কিশোরী তার শরীরের দিকে চাইল। ছেঁড়া শাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজ্। আলোটা এখনও জ্বলছে। নোটগুলো এখনও ওখানে ছড়ানো। ঐ যে সুইচ্।

আলো নিবে গেল।

১১

বিনোদ ঢুকল। হাফ্ স্ক্রীনের সাম্‌নে এসে সুইচে হাত দিল। আলো জ্বলে উঠল।

মেঝের ওপর পড়ে শাড়ি আর ব্লাউজ্। বিনোদ চেয়ে রইল সেইদিকে অল্প একটুক্ষণ। তারপরই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার হাতে সেই শাড়ি আর ব্লাউজ্।

আলো জ্বলছে।

বিনোদ ফিরে এলো। তার হাতে একখানি ধুতি।

হাফ্ স্ক্রীনের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে সেটা ভেতরে ফেলে দিল।

—হ্যাট্-স্ট্যাণ্ডের র‍্যাকের ওপর আগে যা দেখেছিলে তা ঠিকই আছে, বিনোদ বলল। শাড়ি আমার বাড়িতে আছে বটে, তবে কেউ না কেউ সেগুলো পরেছে। এই ধুতিটা সবে কেনা হয়েছে, কেউ পরেনি এখনও। আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে বাইরে যাচ্ছি। বাইরে আসবার জন্যে তৈরি হয়ে আলো জ্বেলো। আমি আসব। হ্যাট্-স্ট্যাণ্ডের র‍্যাকের ওপর যা দেখেছিলে তা অবশ্য ঠিকই থাকবে।

বিনোদ চলে গেল। আলো নিবে গেল।

১২

আলো জ্বলল। বিনোদ এলো। হাফ্ স্ক্রীনের পাশে কিশোরী দাঁড়িয়ে, পরণে তার সেই ধুতি। নোটগুলো তেমনি ছড়ানো পড়ে রয়েছে।

বিনোদ নোটগুলোর দিকে চাইল। তারপর কিশোরীর মুখের দিকে চাইল। বলল, আজ রাত্তিরে একা একা না যাওয়াই ভালো। কাল সকালে যেয়ো। ওগুলো আঁচলে বেঁধে নাও। তোমাকে আজ রাত্তিরে আমার আর বিরক্ত করবার দরকার হবে না। ইচ্ছে হ'লে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তুমি ঘুমোতে পারো।

কিশোরী বিনোদের মুখের দিকে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে তাকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—ও কি, বিনোদ ডাকল।

কেন ? ঘুরে দাঁড়িয়ে কিশোরী জিজ্ঞাসা করল।

নোটগুলো দেখিয়ে বিনোদ বলল, ওগুলো নিলে না ?

আমি দাম নিই, দান নিই না।

বিনোদ চমকে উঠে কিশোরীর দিকে চাইল।

—আপনার দরওয়ানকে বলুন দরজা খুলে দিক্।

কিশোরী এগোল।

শোনো, শোনো,—বিনোদ কিশোরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওগুলো নিতে না চাও, পড়ে থাক্। কিন্তু এত রাত্রে একা একা তুমি রাস্তায় বেরিও না। এসো আমার সঙ্গে।

বিনোদ এগোল। কিশোরী তার পেছনে।

১৩

বিনোদ বারান্দার উল্টো দিকের একটা ঘরের দরজা খুলল। আলো জ্বালল। কিশোরী ঢুকল।

সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল। দু' পাশে চেয়ার। পাশে একটি ছোট টেবিলের ওপর একটি বড় টাইপ্-রাইটার। টেবিলের ওপর, র‍্যাকের ওপর বড় বড় খাতা—কতক সাজানো কতক ছড়ানো।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর কিশোরীর শাড়ি-ব্লাউজ পড়ে রয়েছে।

একটা চেয়ার দেখিয়ে বিনোদ বলল, বোসো।

কিশোরী বসল।

তুমি কে বলো তো ?

সে খবরে আপনার দরকার ?

সত্যি কথা, বিনোদ হেসে উঠল। আমি কে না জানলে তুমি কে তা তুমি আমাকে বলবে কেন ! কিন্তু আমি কে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?

না।

টেবিলের ওপর তোমার ঐ শাড়ি-ব্লাউজ দেখেও না ?

কিশোরী ঘাড় নাড়ল।

—তোমার মতো নারীদের প্রাণ আর মান যারা কেড়ে নিচ্ছে, মধ্যবিত্ত অল্পবিত্ত আর দরিদ্রদের কেনবার ক্ষমতার নাগালের বাইরে অন্নের দামকে তুলে ধরে, আমি তাদেরই একজন।

বুঝলাম না, কিশোরী বলল।

আমি চালের ব্যবসা করি—বিনোদ চেঁচিয়ে উঠল।

কিশোরী চাইল তার দিকে।

তোমার বাবা বেঁচে আছেন ? বিনোদ জিজ্ঞাসা করল।

না।

দাদা ?

নেই।

কোনও পুরুষ অভিভাবক ?

এই দুর্দিনে অভিভাবক হবার দায়িত্ব নিতে রাজি নন্।

তোমার স্বামী ?

বিয়ে হয় নি।

তোমার মা ?

কিশোরী চুপ করে রইল।

তোমার অন্য কোনও ছোট ভাই বোন্ ?

কিশোরী জবাব দিল না।

—বুঝেছি, বলে বিনোদ টাইপ-রাইটারটির কাছে গেল। দু'বার খট্‌খট্ করল টাইপ-রাইটারটাকে নিয়ে। এই টাইপ্-রাইটার দিয়ে, বিনোদ বলল, এই রকম আরও অনেক টাইপ্-রাইটার দিয়ে, আমরা চিঠি লিখি, হিসেব করি। চালের ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি, এই ব্যবসাতে আমাদের লাভের হিসেব। এই টাইপ-রাইটার করে খটাখট্, খটাখট্, আর ওদিকে তোমার মতো মেয়েরা প্রাণ হারাবার ভয়ে মান হারায়। তাদের পরণের শাড়ি-ব্লাউজ্ জমা হয় আমাদের টেবিলে।

প্রাণ হারাবার ভয়ে নয়—কিশোরী মুখ তুলে বলল।

—আমিও আন্দাজ করেছিলাম সেটা, বিনোদ জবাব দিল। নিজে না খেয়ে মরবার ভয়ে যে তুমি পথে পথে দাম চাইতে বেরোও নি, তা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু কোথায় তারা যাদের অনাহারে মৃত্যু রোধ করবার জন্যে —

আমার মা, আমার ছোট ভাই—কিশোরী বলে উঠল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় তাঁরা ?

কণ্ট্রোলের দোকানের সাম্‌নে—

বুঝেছি। রাস্তার নাম বলো।

কিশোরী রাস্তার নাম বলল।

বিনোদ চেঁচিয়ে উঠল, দারওয়ান্, গ্যারেজ্ খোল্ দেও !

১৪

গাড়ি বের করতে বিনোদ সময় নিল না মোটেই। কিশোরী তার পাশে বসল। দরওয়ান্ গেট্ খুলে দিল। গাড়ি বেরিয়ে গেল।

ব্ল্যাক্‌আউটের রাত্তিরে হেড্ লাইটের ঘোম্‌টা-দেওয়া আলোয় হাতড়াতে হাতড়াতে ধীরে ধীরে মোটরটা চলছে। বিনোদ বলল, তোমার বাবা কি করতেন ?

কিশোরী জবাব দিল, সামান্য জমিজমা ছিল।

চাকরিবাকরি কিছু করতেন না ?

না। তাঁর গান বাজনার বড় শখ ছিল। তাই নিয়েই সময় কাটাতেন।

হুঁ।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ বিনোদ বলল, তোমার বাবা কি কখনও কলকাতায়

আসতেন না—এই গানবাজনা সম্পর্কে কোনও জলসায় বা উৎসবে ?

হ্যাঁ। আসতেন মাঝে মাঝে।

তাঁর নাম কি ?

৵রসিকলাল ঘোষ।

গাড়ি একটা মোড় ঘুরল।

—তুমি খানিকটা লেখাপড়া শিখেছ মনে হচ্ছে।

কলকাতায় হোস্টেলে রেখে বাবা পড়িয়েছিলেন—যতদিন বেঁচে ছিলেন, নিজেরা না খেয়েও আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

হুঁ। তাঁর মৃত্যুর পরই—

আমি গ্রামে ফিরে গেলাম। পড়াশুনো বন্ধ।

তা তোমার স্কুলজীবনের কোনও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করেছিলে ?

না। যারা আপন তারা যখন অনায়াসে তাড়িয়ে দিল দেখলাম, তখন পরের করুণা চাইবার মতো মনের জোর আর রইল না।

তোমার আত্মীয়-স্বজন আছেন তাহ'লে !

আছেন। কাকা।

তা' তিনি—

আমাদের এই বাজে ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চাইলেন না কাকিমার সঙ্গে তাঁকে ঘর করতে হয়।

কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে গাড়ি থামল।

মাকে ভাইকে ডেকে নিয়ে এসো, বিনোদ বলল।

কণ্ট্রোলের লাইনে একটা সাড়া পড়ে গেল। সবাই দেখতে লাগল এত রাত্তিরে গাড়ি চড়ে এখানে কে এলো।

মাকে ভাইকে খুঁজে আনতে কিশোরীর দেরি হ'ল না। কিন্তু গাড়ি দেখে আর বিনোদকে দেখে তারাকিংকরী চিন্তিত হ'লেন।

বললেন, কিশোরী বলল তুমি নাকি আমাদের নিয়ে যেতে এসেছ। কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি না, বাবা।

বিনোদ তারাকিংকরীর মুখের দিকে একটু স্থির হয়ে চাইল। বলল, আপনার স্বামীর গানবাজনায় বড় হাত ছিল। কলকাতায় যখন আসতেন তখন আমরা তাঁর আলাপ শুনতাম। আমরা ছিলাম তাঁর ভক্ত। আপনার মেয়েকেও তো আমি চিনি না। রসিকবাবুর নাম শুনে বুঝলাম। আপনারা কলকাতায় আসছেন যদি জানাতেন আমাদের—

আমরা তো ইচ্ছে করে আসিনি বাবা, বাধ্য হয়ে এসেছি। আর তাছাড়া তাঁর গান বাজনার লোকে সুখ্যাতি করে এ তো শুনিনি। আত্মীয়-কুটুম্ব মহল তো বরাবর তাঁকে ছ্যা-ছ্যা করেছে। আমি তাঁকে বাধা দিতাম না বলে আমাকেও কত কি শুনিয়েছে!

তিনি প্রকৃত গুণী ছিলেন। তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা রয়েছে। আমি

খবর পেয়েই এসেছি। তাঁর অবর্তমানে আপনাদের কোনও কষ্ট, কোনও অসম্মান হয়, বিশেষতঃ এই দুর্দিনে, এ আমরা চাই না। তাই আমি এসেছি। আপনার চলুন।

কিশোরী ? তারাকিংকরী অসহায় হয়ে কিশোরীর মুখের চাইলেন।

আমরা তো চিরদিনের মতো এঁর গলগ্রহ হয়ে থাকব না, মা। বাবার ভক্ত ইনি, এঁকে ক্ষুণ্ণ করা কি—কিশোরী কথাটা শেষ করতে পারল না!

—জোর করবার মতো দাবি আমার নেই, বিনোদ বলে উঠল। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার স্বামীকে যে শ্রদ্ধা করে তাকে অবিশ্বাস করারও কোনও কারণ আপনার ঘটবে না। যদি কোনও অসুবিধে হয় তো যে কোনও মূহূর্তে আপনারা দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

তাহলে চলো, বাবা।

উঠুন, গাড়িতে উঠুন।

তারাকিংকরী, কিশোরা, সুবল গাড়িতে ওঠার পর বিনোদ গাড়ির দরজা বন্ধ করে চালকের জায়গায় গিয়ে বসল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কন্ট্রোলের লাইনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলে উঠল, মেয়েটা মক্কেল ফাঁসিয়েছে!

তারপর তাদের হি হি করে হাসির শব্দ গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার শব্দের সঙ্গে জোট্ পাকিয়ে গেল।

১৫

সকাল বেলায় যখন বিনোদের ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখল সামনে দেয়ালের ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে, আর কিশোরী পাশে দাঁড়িয়ে, তার হাতে এক পেয়ালা চা।

আপিস ঘরে চেয়ার সাজিয়ে তারই ওপর শুয়ে বিনোদ যখন কালকের রাতটা কাটাবে স্থির করেছিল তখন তার বাড়িতে ঘরের অভাবের কথা সে ভাবে নি। কারণ কিশোরীকে, তার মাকে আর তার ভাইকে বিনোদ তার বসবার আর শোবার ঘর ছাড়া আলাদা ঘরে থাকতে দিয়েছিল— খাবার ঘরের পাশের ঘরটায়। বিনোদ যে যেতে পারেনি তার বসবার ঘরের নগ্ন নারীমূর্তিগুলোর মাঝখানে বা তার শোবার ঘরের একাকী শয্যার হঠাৎ-সাথী-জোটানোর গোপন ক্ষমতার রাজ্যে তা বোধ হয় নেহাৎ-ই তার ক্লান্তির জন্যে।

কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে চা নিয়ে, পরণে তার সেই ধুতিখানি।

—আটটা বাজে। খুব সকাল সকাল ঘুম ভাঙাই নি তো? কিশোরী জিজ্ঞাসা করল।

না। আমি তো এর চেয়ে ভোরেই উঠি! এটা কি এনেছেন্? বেড টি?

কেন? খাওয়া অভ্যেস নেই?

বাসি মুখে নয়। বিনোদ মুখ ধুতে চলে গেল।

কিশোরী দেখল, টেবিলের ওপর তার সেই শাড়ি-ব্লাউজ তেম্‌নি পড়ে আছে।

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে কিশোরী চলে গেল।

কোঁচার খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে বিনোদ ফিরে এলো। দেখল ,কিশোরী নেই। চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের ওপর বসানো।

ডাকল, মধু, মধু—

মধু ঢুকতেই বলল, আমি বেরোব এখুনি। কেউ টেলিফোন করলে বলবি, অফিসে গেছি। যাঁরা এসেছেন কাল রাত্তিরে, দেখিস্ যেন তাঁদের কোনও অসুবিধে না হয়। আর পাঁড়েকে ডেকে আমার এই বসবার আর শোবার ঘর দুটো খালি করে দিস্!

কিন্তু অত জিনিস রাখব কোথায়?

পাঁড়ের ঘরের পাশের গুদামঘরটায়। শুধু আমার ছোট খাটটা এই ঘরে দিয়ে যাস্।

চা খেয়ে বিনোদ চলে গেল। কাপটা উঠিয়ে নিতে গিয়ে মধু ভাবনায় পড়ল। এ রকম অদ্ভুত হুকুম মধু আগে কখনও পায়নি। এরা কারা? বাবুর এ রকম হুকুম কেন?

১৬

আত্মস্থ হয়ে কিশোরী যখন ফিরে এল তখন দেখল বিনোদ নেই। খালি চায়ের কাপ নিয়ে মধু দাঁড়িয়ে।

বলল, বাবু কোথায় গেলেন মধু?

আপিসে। বলে গেলেন আপনাদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়। যদি কিছু আনতে টানতে হয়—

না। কিছু দরকার নেই।

রান্নাবান্না?

কেন? ঘরে যোগাড় নেই?

আছে। বাবুর রান্না আমিই তো করি। তা আপনারা কি আমার হাতে খাবেন?

আমি খেলেও আমার মা খাবেন না। তাই রান্নার ব্যাপারে আজ তুমি ছুটিই নাও। তোমার বাবু কি খেতে টেতে ভালোবাসেন বলো। আমরাই রাঁধব তোমাদের সকলের জন্যে।

রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেল বারোটার মধ্যে। কিন্তু একটা পর্যন্ত বিনোদের দেখা নেই। তারাকিংকরী খেতে পারছেন না। কিশোরীও ছট্‌ফট্‌ করছে। শুধু সুবল খেয়ে নিয়েছে ছুটি।

—বাবু কি দুপুর বেলায় বাড়িতে খেতে আসেন না, মধু? কিশোরী জিজ্ঞাসা করল।

আসেন তো রোজই।

আজ যদি আসতে অসুবিধে হয় তো না হয় আপিসেই তাঁর খাবার নিয়ে যাও তুমি। একটা টেলিফোন করো না।

টেলিফোন আর মধুকে করতে হ'ল না। আপিস থেকেই এলো টেলিফোন।

টেলিফোনে কথা শেষ করে মধু বলল, এই নিন্। অপিস থেকে টেলিফোন করছে বাবু বাড়িতে আছে কিনা। এখানে বলে গেল আপিসে যাচ্ছে অথচ, আপিসে যায় নি। ওর কাণ্ডই এ রকম। আপনারা আর বসে আছেন কেন? খেয়ে নিন্।

তারাকিংকরী বললেন, তা কি হয়?

দুটো বাজল' টেলিফোন এলো একটা। মধু ধরল। বলল, বাবু টেলিফোন করছেন।

কিশোরী টেলিফোন ধরল। বলল, কি ব্যাপার বলুন তো? খাওয়া দাওয়া হবে না আজ?

জবাব এলো, সেই কথাই তো বলছি। আমি অফিসে বেরুব বলে অফিসে যেতে পারিনি। অন্য একটা কাজে আটকে গেছি। এখন বাড়ি ফিরতে পারব না। আমি খেয়ে নিয়েছি। আপনারা আমার জন্যে বসে থাকবেন না। খেয়ে নিন্।

রাত্তিরে খাবেন তো বাড়িতে?

হ্যাঁ। খাব বৈ কি!

কালকের মতো রাত্তির হবে তো?

দেখুনই না কি হয়! হাসির আওয়াজ একটু শোনা গেল।

হাসিমুখে কিশোরী টেলিফোন নামিয়ে রাখল। বলল, বিনোদবাবু বাইরে খেয়ে নিয়েছেন, মা। তুমি আর দেরি ক'রো না। চলো।

১৭

খেয়ে এসে কিশোরী দেখল অবাক্ কাণ্ড। মধু আর পাঁড়ে কুলি ডেকেছে জনকয়েক, আর বিনোদের বসবার আর শোবার ঘর থেকে যাবতীয় জিনিস মায় ছবি, সৌখিন জিনিসপত্র সমেত সব বের করে দিচ্ছে ঘর থেকে আর সে গুলো পুরে রাখছে পাঁড়ের ঘরের পাশের গুদামঘরটায়। শুধু বিনোদের খাটখানা গেল বিনোদের অফিসঘরে।

—কি ব্যাপার মধু? কিশোরী জিজ্ঞাসা করল।

বাবুর হুকুম।

কেন?

তা তো জানি না।

কিশোরীর মাথা আরও গুলিয়ে গেল যখন আসবাবপত্র নিয়ে একটা বড় লরি এসে দাঁড়াল বাড়ির দরজায়, আর জিনিস পত্র নামতে আরম্ভ করল বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে।

মধু এসে একখানা চিঠি দিল কিশোরীর হাতে। আর জামা কাপড়ের বিরাট্ একটা বাণ্ডিল।

কিশোরী পড়ল,—কালরাত্রে বড়ই অসুবিধে হয়েছে আপনাদের। আশা করি আমার শোবার আর বসবার ঘরের জঞ্জালগুলো এতক্ষণে বিদেয় হয়ে গুদামঘরে বন্দী হয়েছে। যাই হোক্ নতুন আসবাবপত্র পাঠালাম, আর কিছু জামাকাপড়। খানকয়েক ছবিও। আপনি একজন শিল্পীর মেয়ে। আপনার

রসবোধ কেমন দেখব যদি সন্ধ্যের মধ্যে ঘর দু' খানা সাজিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ, যে ঘরগুলোতে আমি থাকতাম সেগুলো এখন আপনারা ব্যবহার করবেন। আপনাকে খুশি করবার জন্যে আমি এ সব করছি না। কিন্তু আপনার মা বা আপনার ছোট ভাইয়ের কোনও কষ্ট হবে এও আমি চাই না। একটা টেবিল হার্‌মোনিয়াম্‌ পাঠালাম। আশা করি আপনাদের বসবার ঘরে সেটা স্থান পাবে। সন্ধ্যাবেলায় দেখা হবে। বিনোদ।

এ সব কি কিশোরী? তারাকিংকরী বললেন।

এই তো চিঠিতে লিখেছেন, এই দিককার ঘর দুটো আমাদের থাকবার জন্যে ছেড়ে দিলেন, আর জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন সন্ধ্যের মধ্যে সব গুছিয়ে ফেলতে পারো কি না দেখব।

কিন্তু এত সব। আমরা গরীব, আমাদের জন্যে—

গরীব বলে কৃপা করলে তো কিছু দান করে পুণ্য সঞ্চয় করতেন। উনি বাবার গুণের আদর করছেন, তাঁরই স্মৃতির সম্মান করছেন। এতে তোমার আমার তো ভয় পাবার কিছু নেই, মা!

কি জানি বাপু, তারাকিংকরী বললেন। কিন্তু আমার মনে হয় এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই ভালো হত। আমরা গরীব-গেরস্ত লোক।

১৮

এটাই আশ্চর্য যে কিশোরী ক্লান্তি বোধ করল না একটুও। কুলীরা হাঁপিয়ে গেল, পাঁড়ে বাপ্ না বললেও হাঁফ ছেড়ে পালিয়ে গেল, নিরুপায় মধু গা ঢাকা দিতে না পেরে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বোধ করি ভগবান্‌কেই ডাকতে লাগল, কিন্তু কিশোরীর উৎসাহ কমল না একটুও। রঙীন্ শাড়িটা এক-রঙা ব্লাউজের ওপর পরে কোমরে আঁচলটা শক্ত করে জড়িয়ে সেই যে ঘর সাজাতে ও লেগে গেল, ওর কাজ শেষ করল যখন সন্ধ্যে হব-হব। তারাকিংকরী চা করে ডাকতে লাগলেন। কিশোরী বলল, তুমি খেয়ে নাও, মা। আমার দেরি আছে।

কলঘরে মেয়ের গুণ্ গুণ্ গান শুনতে না পেলেও তারা-কিংকরী বুঝলেন যে আজকের দিনটা কিশোরীর যেমন আনন্দে কাটল বাবা মরবার পর থেকে এ রকম আনন্দ ও এক দিনও পায় নি। তারাকিংকরী অবাক হ'লেন, এই ভেবে অবাক্ হ'লেন, যে কি এমন গুণ ছিল তাঁর স্বামীর যা তিনি বা তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা কোনও দিন টের পান্‌নি বা স্বীকার করেন নি, অথচ এই অপরিচিত ধনী ছেলেটি সেই স্বর্গগত সংগীত-সাধকের তৃপ্তির জন্যে এত কিছু আয়োজন করে চলেছে।

বেশি ভেবে সময় কাটালে তো চলবে না। বিনোদ হয়তো এখুনি আসবে। তারাকিংকরী তার জন্যে জলখাবার তৈরি করতে লেগে গেলেন।

১৯

সুবলের জন্যে বড় রবারের বল, এয়ার গান্ এবং টুকিটাকি আরও কতকগুলো খেলনা হাতে বিনোদ যখন বাড়ি ঢুকল তখন তার চেহারা দেখে একেবারেই মনে হ'ল না যে তার আজ দিনভোর স্নান খাওয়া হয়েছে।

কিশোরী সাম্‌নেই ছিল। বলল, টেলিফোনে মিছে কথা বলেছিলেন তো। আপনি চান্ করেন নি আজ গোটা দিন। খান্ নি কিছুই।

বিনোদ বলল, সুবলের জামাকাপড় জুতো ছোট বড় কিছু হয় নি তো। আপনার মার থান বা—

—আমার শাড়ি-ব্লাউজ্—হুঁ—সবই ঠিক আছে। কিন্তু ঐ রকমভাবে মিথ্যে কথা বলে দুপুরবেলায় খাইয়ে না দিলে কি চলত না?

আপনাকে খাইয়ে দিয়ে পাপ যদি কিছু আমার হয়েই থাকে তো তার প্রায়শ্চিত্তও আমি করছি। আপনারই মতো অনেক মেয়ে আজ আমারই দৌলতে অভুক্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই দুঃখ আমার কিছু নেই। আপনারও থাকা উচিত নয়। এগুলো সুবলকে দিন। আমি চান করে আসি।

২০

চা-টা খেয়ে সুবল বিনোদের ভূতপূর্ব বসবার ঘরে বল-টল্-গুলো পরখ করে দেখছিল। হারমোনিয়াম্‌টাও টুং টাং করছিল মাঝে মাঝে। তারাকিংকরী ঢুকলেন চা খাবার নিয়ে। তারপরই কিশোরী। পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে ঘাসের চটি পায়ে ঢুকল বিনোদ। বলল, এখানে আসবার হুকুম দিলেন কেন? আপিস ঘরে পাঠিয়ে দিলেই তো পেতাম।

তা কি হয়, বাবা! খেটে-খুটে এলে সারাদিন। সাম্‌নে বসিয়ে না খাওয়ালে যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে।

লুচিতে কামড় দিয়ে বিনোদ বলল, তুমি খেয়েছ সুবল?

হ্যাঁ।

আপনি?

আমি খাব এখন। কিশোরী বলল।

এখুনি খান্ না। চা তো রয়েছে।

বিনোদ কিশোরীকে এক কাপ চা ঢেলে দিল।

চারিদিকে চেয়ে দেখল বিনোদ। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, সাবিত্রীর যমরাজের অনুগমন, শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ প্রদান প্রভৃতি পৌরাণিক ছবির গম্ভীর পটভূমিকায় বসবার ঘরটি যারপরনাই শুচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু কোণের দিকে টেবিল হারমোনিয়ামটা একটু যা। তা ওটা দরকার। সংগীতসাধক ৺রসিকলাল ঘোষের মেয়ের পারিপার্শ্বিকই হয়

রীতিমত ক্ষুণ্ণ যদি না সংগীতচর্চার কোন উপকরণ সেখানে থাকে।

ভেতরের ঘরখানার কি চেহারা হয়েছে তা এগিয়ে দেখবার ইচ্ছাটা বিনোদ দমন করল। নিশ্চয়ই এই রকম একটা নেহাৎ-ই পবিত্র আবহাওয়া রচিত হয়েছে। দেবদেবীর পট তো অনেকগুলোই সে পাঠিয়েছিল। নলদময়ন্তীর ছবিখানা বোধ হয় শোবার ঘরেই স্থান পেয়েছে কিংবা হয়তো কিশোরী সেটাকে টাঙায় নি একেবারেই। কথাটা কিশোরীকে জিজ্ঞসা করবার ইচ্ছাটাও বিনোদ দমন করল।

রান্না কেমন হয়েছে, বাবা? তারাকিংকরী জিজ্ঞাসা করলেন।

মধু কোথায়? বিনোদ বলল।

ঐ যে আসছে। জল আনছে তোমার জন্যে।

আপনাদের তো চিরদিন ধরে রাখতে পারব না, কাজেই ভালো হয়েছে বলে মধুকে চটাই কেন? ওর রান্না খেয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে চিরদিন।

বালাই, ষাট্! সোনার চাঁদ ছেলে তুমি। বিয়ে-থাওয়া করো।

মধু জল নিয়ে ঢুকছিল। কথাটা কানে গেল তার। বলল, বিয়ে করবেন এই বাবু। তবেই হয়েছে! ওঁর কনে কি এদেশে আছে, মা? বিলেত থেকে পার্শেল করে যদি কেউ পাঠায় তবেই বোধ হয় ওঁর বিয়ে হবে।

সে কি ?

সত্যি কথা, মা—খাঁটি সত্যি কথা। মামাবাবু কি কম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাবুর আমার ঐ এক কথা। মেয়ে পছন্দ নয়। আর জোর করে বিয়ে দিলে বিবাগী হব, বিষ খাব, এই সব।

তোমার মামা ? তারাকিংকরী বললেন।

ছেলেবেলা থেকে মামা-মামীমা এঁরাই আমাকে মানুষ করেন। খুব ছোটবেলায় আমার বাবা-মা দুজনেই মারা যান্। বিনোদ জবাব দিল।

মামাবাবুর হয়েছে শতেক জ্বালা। মধু বকে চলল। নিজের ছেলেপুলে নেই, ভাই-ভাইপো কিছু নেই—কুল্লে এই ভাগ্নে সম্বল—তাই চোর হয়ে আছে। কখনও কিছু বলতে পারে না। বললেই ঐ এক কথা, বিবাগী হব, বিষ খাব !

তুই থাম্ মধু—

আর মামা যদি বা একটু বকাঝকা করেন তো মামী শুনলেই বলবে, চললুম আমি, গঙ্গায় ডুবে মরব। এই করে করে, আপনি বিশ্বাস করবেন না মা, ছেলেটির মাথা ওঁরা খেয়েছেন।

ফের্ বক্‌বক্ করছিস্ মধু ? বিনোদ ধমকে উঠল।

তুমি থামো তো। মধু জবাব দিল। বলল, আরে তুমি তো সেই কচিটি। রথের মেলা দেখতে নিয়ে গেলুম কোলে করে। গলার হার ছিল, চোরে কেটে নিল। এক কাঁখে তুমি, এক হাতে চোর।

সে কি? কিশোরী বলল।

শোন তবে, দিদিমণি। চাদরশুদ্ধু চোরের গলা তো মুঠিয়ে ধরলাম। ব্যাটা মুখে ফেলে দিয়েছিল হারটা। লোকজন জড় হ'ল। মুখ হাঁ করিয়ে ব্যাটার মুখ থেকে বের হ'ল হারটা। সবাই বলল, পুলিশে দাও। আমি বললাম, আমার বাবুই আমার পুলিশ। নিয়ে চলো শালাকে ধরে আমার বাবুর কাছে! তাই নিয়ে এলো।

তারপর?

বাবু তখন বেড়াতে বেরোচ্ছিলেন। হাঁক্ পাঁক্ করে উঠলেন। ভাবলেন ভাগ্নের বুঝি কিছু হয়েছে। আরে সে মধুর কোলে রয়েছে—তার হবে কি! তা আমি যত বলি চোরের কথা, বাবু বলে ছেলের কি হ'ল। মামী এসে তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিল আমার কোল থেকে। বলল, দেখ গো, গাটা যেন একটু ছড়ে গেছে। এই যায় কোথা! মামাবাবু অগ্নিশর্মা! আমি ভেবেছিলুম বাবুর সাম্নে চোরটাকে দোব বেশ ঘা কতক। ওমা! বাবু বলল হার পার পাওয়া গেছে? আমি উঁচু করে দেখালুম, এই যে! বাবু বলল, চোরটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বেশ করে ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দাও। পুলিশে দিয়ে আর কি হবে। আমার তো মহা ফুর্তি। ভিড়ের সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি, চোরটাকে দোবো ঘা কতক, বাবু ডাকলেন, দাঁড়া মধু। কি ব্যাপার! একা দাঁড়িয়ে আছি। সাম্নে মামাবাবু, মামীমা, মামীমার কোলে এই মূর্তিমান্, তখন কচি, বুঝলে মা,

একেবারে কচি ছেলে। ওদিকে চোর ব্যাটাকে সবাই মিলে দিচ্ছে ঘা কতক, আর আমি যেতে পারছি না। ছটফট্ করছি।

বাবু বললেন, মধু।

আজ্ঞে।

হারটা তোর কাছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওটা তুই নে।

আজ্ঞে—

না না, ওটা তুই নে।

ভাবলুম, ভালো কথা। এবার চোরটাকে—

পা বাড়াতে না বাড়াতেই বাবু ডাকলেন, মধু!

আজ্ঞে।

এই ছেলেটি কি তোর শত্তুরের ছেলে?

আজ্ঞে সে কি কথা বাবু?

মনে হচ্ছে যেন তোর কাছে এ'টা সোনার হারের দাম এই ছেলের প্রাণের দামের চেয়ে বেশি।

আজ্ঞে সে কি!

নয়তো কি! তুইতো খুব গায়ের জোর দেখিয়ে চোর ধরছিলি। ধর্, সেই তকে যদি এই ছেলেটাকে কেউ জখম করে দিত,কি ধর্—ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চোটই লেগে যেতো—একটা সাংঘাতিক—

মামীমা অম্‌নি ফোঁস্ করে উঠল। বলল, এই দেখ না, এতখানি ছড়ে গেছে গা।

বাবু কি ছাড়বার পাত্র? বলল, তুই যদি এসে বলতিস্ চোরে গলার হার চুরি করে নিয়ে গেছে তাহ'লে কি আমি তোকে অবিশ্বাস করতুম না ভাবতুম তুই এই হার চুরি করেছিস্।

আজ্ঞে তা কি হয়!

মামীমা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, ছেলের চেয়ে তোর কাছে সোনার দাম বেশি। তোকে দিয়ে তো ছেলে মানুষের কাজ হবে না বাবা। তুই দেউড়িতে গিয়ে পাহারা দিগে যা। চোর-ছ্যাঁচোড় তাড়াতে পারবি।

সটান্ সেইখানে শুয়ে পড়ে, বুঝলে মা, সটান্ সেইখানে শুয়ে পড়ে আমি মেপে সাতহাত নাকখৎ দিলুম। বললুম, বাবু, আর হবে না। এ রকম ভুল আর হবে না। যতদিন বাঁচব এই ছেলের সঙ্গেই থাকব। এই ছেলের কাছেই থাকব। সোনা-দানার চেয়ে এ আমার দামী। আর ভুল আমার হবে না।

ব্যাটা কেঁদে ফেললি যে! বিনোদ বলল।

শুনছ দিদিমণি, শুনছ ছেলের কথা। মধু বলে উঠল। আমার ভাগ্যি ভালো যে এতদিন পরে আমি কাঁদতে পারছি। বুড়োবুড়ী তো রকম-সকম দেখে কাঁদতে না পেরে হিম হয়ে কাশী চলে গেল। আজ সন্ধ্যেয় তুমি বাড়ি আছ, আজ আমি কাঁদব না তো কাঁদব কবে?

বিনোদ চম্‌কে চাইল মধুর দিকে। কিশোরী চাইল বিনোদের দিকে।

তারাকিংকরী কথাটা ভালো করে বোঝবার আগেই কিশোরী সামলে নিল। বলল, মধুদা, শীগ্‌গির যাও। এত গল্প করছ যে ওদিকে চায়ের জল বোধ হয় ফুটে মরে গেল।

মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে মধু চলে গেল।

কিশোরী ভাবল, বেচারী বুড়ো হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি না থাকা নিয়ে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলল।

হাসিকান্নায় মেশানো মধুর মুখের দিকে চেয়ে বিনোদ অন্যরকম ভাবল। এই কথাটা যে মধু মনের ভুলে বলেনি, ইচ্ছে করেই বলেছে, এ সম্বন্ধে বিনোদের কোনও সন্দেহই রইল না।

২১

চা নিয়ে এলো মধু। আর একবার সকলেই চা খেল। বিনোদ বলল, হার্‌মোনিয়াম্‌টা রয়েছে। বাবার কাছে অনেক কিছু নিশ্চয়ই শিখেছেন। যদি দু'একখানা শুনিয়ে দেন্‌।

না, আমি তো জানি না ভালো, কিশোরী লজ্জায় পড়ল একটু।

আমার মাথা খাও দিদিমণি, 'না' ব'লো না। নইলে বাবু আবার—

তুই থাম্ মধু! বিনোদ ধম্‌কে উঠল। মধুকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

কিশোরী গিয়ে বসল হার্‌মোনিয়াম্‌টায়। তার বাবার সারা জীবনটা কেটে গেছে অনাদরে। তিনি যে গুণী একথা মানতেও চায়নি কেউ। কারণ সংগীতের অঙ্কশাস্ত্র তাঁর খুব ভালো জানা থাকলেও কণ্ঠস্বর তাঁর তেমন মিষ্ট ছিল না। তাঁর কাছে যারা তালিম নিয়ে যেত তারা কেউ স্বীকার করত না যে তারা তাঁর ছাত্র।

আজ সেই অনাদরে অসহায়ভাবে মৃত মনীষীর গুণের পরিচয় জগতের প্রতিনিধি হিসাবে এই লোকটি জানতে চাইছে। কিশোরী কি পারবে, পারবে কি তার বাবার শিক্ষার সম্পূর্ণতাটুকু অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলতে? চোখের জল মুছে কিশোরী গান গাইতে লাগল—তার বাবার বহুপ্রিয় একখানি গান—যা যখন তখন একতারা নিয়ে তার বাবা গাইতেন, আর যে গানটা শুনে তার মা চিরকাল গজ্‌ গজ্‌ করতেন।

কিশোরী গাইল,—

দুখের পাহাড় যখন আসে গুঁড়িয়ে দিতে

আড়াল করে দাঁড়ায় কে সে সরিয়ে দিতে?

হারিয়ে দিতে যত প্রলয় সর্বনাশা

দীনের তরে তার যে এত ভালোবাসা,

জীবন কাটুক্ শুধুই তারে খুঁজে নিতে!

গোবর্ধনের গিরির গায়ে অমর চিহ্ন আঁকা,
তোমার দয়ার বর্মে জীবের কোমল হৃদয় ঢাকা ;
যুগে যুগেই আসছ তুমি বাঁচিয়ে দিতে,
দুখের ভারে দীনের মরণ এড়িয়ে দিতে,
অলস প্রাণের হতাশ সে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে,
জীবন কাটুক্ শুধুই তোমায় খুঁজে নিতে।

কোথায় চলে গেল কিশোরীর মন এই গান গাইতে গাইতে তা যারা শুনছিল তারা ভাবতেই পারল না। মাঠে মাঠে এই গান গেয়ে বেড়াতেন তাঁর বাবা—ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে কাটফাটা রোদে হাঁটতে হাঁটতে গাইতেন এই গান—বাগানের বেড়া বাঁধতে বাঁধতে এই গান গেয়েছিলেন, গেয়েছিলেন এই গান যখন আকাশ ছেয়ে মেঘ করে বজ্র গর্জে উঠেছিল সহুংকারে, যখন বৃষ্টি পড়েছিল মুষলধারায়, অনটনে সংসার যখন অচল হ'ত তখনও গুণ্ গুণ্ করে গাইতেন এই গান—যাকে খুঁজে নিতে জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিলেন, তাকে কি খুঁজে পেয়েছেন তিনি ? কিশোরী ভাবল, তাকে কি খুঁজে পাওয়া যায় ?

মধুর চোখে জল, তারাকিংকরী শিউরে শিউরে উঠছেন। একতারাতে বেসুরো গলায় যে গান শুনতেন আর বিরক্ত হ'তেন সেই গান এ কি শক্তি এ কি মাধুর্য নিয়ে হাজির হ'ল

তাঁর সাম্‌নে। তিনি কি ভুল বুঝেছিলেন তাঁর স্বামীকে সারাজীবন, ছোট ভেবেছিলেন তাঁকে ?

সুবলের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বাবার কথা তার মনে পড়েছে।

বিনোদ ভাবল, এই গানটি এই মেয়েটির কাছে শুধু গান নয়। ঐ তার প্রাণ। বলল, গানটি কি আপনার বাবাই লিখেছিলেন ?

কিশোরী বলল, হ্যাঁ।

কি লিখেছিলেন কিছুই বুঝলাম না—একটি মেয়ে বলে উঠল। পরণে তার হাওয়া শাড়ি, জ্যাল্‌জেলে ব্লাউজ—স্ত্রী-সৌন্দর্যের শোভা লোকের চোখের সাম্‌নে ঠেলে দিতেই এই পোষাকের পরিকল্পনা—পায়ে হাই-হিল্‌ সু। গানের মধ্যে কখন যে মেয়েটি ঘরে ঢুকেছে তা কেউ খেয়াল করে নি।

সুরমা—তুমি !—বিনোদ দাঁড়িয়ে উঠল।

হ্যাঁ। আমি। খবর না পাঠিয়ে চুপি চুপি এলাম। কারণ, খবর দিয়ে এলে গান শুনতে পেতাম না। আর হয়তো যিনি গান গাইছেন তাঁকেও দেখতে পেতাম না।

তা হ্যাঁ, এসেছ ভালো করেছ। তোমার অর্ডার মতো মালগুলো আমি কাল ঠিকই পাঠিয়ে দোব। তা চলো—অফিস ঘরে চলো—

অফিস ঘরে ! কেন ? সুরমা প্রশ্ন করল, তোমার এমন

চমৎকার বসবার ঘর, শোবার ঘর এগুলো কি বেদখল হয়ে গেল ?

সে সব শুনো এখন—চলো। বলে বিনোদ এগোল।

কত লীলাই যে জানো, বলে একটু মুচকি হেসে বিনোদের পেছনে চলল সুরমা।

তারাকিংকরী চাইলেন কিশোরীর দিকে। কিশোরী মুখ ফিরিয়ে নিল। মধু যে কখন গজ্ গজ্ করতে করতে সরে পড়েছে কেউ লক্ষ্য করেন নি।

সুবল শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। অনেক ঘটনাই আজকাল ঘটছে যা ও বুঝতে পারছে না। এ ঘটনাটিও সেই রকমের একটি।

২২

অফিস ঘরে এসে বিনোদ ঢুকল, পেছনে সুরমা।

—দু বাহু বাড়ায়ে কাকে ডেকে আনলে ঘরে! একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত, রাতারাতির বদলে ? সুরমা বলল।

কি বলছ যা তা ?

ভুল বলছি বলে তো বোধ হয় না। কারণ যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো তোমার আত্মীয় নন্। এক মামা-মামী ছাড়া তোমার আর আছেই বা কে !

হ্যাঁ দেখ, তুমি যে দামে জিনিসগুলো চেয়েছ সেই দামের মধ্যে পাচ্ছি না! তার চেয়ে একটু বেশি পড়বে—বিনোদ চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগল।

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যেয়ো না। লাভ নেই। যাদের দেখলাম তাঁরা আর যাই হোন্ বোকা নন্। অন্ততঃ তরুণীটি তো নন্ই। সুরমা বাধা দিয়ে বলল।

তা তুমি এখন হঠাৎ এ সময়ে—

পাকাপাকি দখল তোমাকে আমি করতে চাইনে। তবে তুমি একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেলেই বা আমার চলে কি করে?

দেখ, এখানে এ সব আলোচনা—

—চালালে তোমার পক্ষে কষ্টকর হবে। তোমার বসবার ঘরের নতুন চেহারা দেখেই আমি তা বুঝেছি। তা তুমি যদি আমার সঙ্গে এখুনি বেরিয়ে পড়ো তাহ'লে আর এ সব আলোচনা এখানে করতে হয় না—ওঁদেরও কানে যাবে না কিছু।

তাহ'লে একবার বলে আসি—

কি বলতে কি বলবে সব গুলিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলো এখন আমার সঙ্গে। ফিরে এসে যা হয় একটা কিছু বানিয়ে ব'লো। ক্ষতি আমি তোমার করতে চাইনে, কিন্তু আমাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলেই বা আমি সহ্য করব কি করে? নাও, চলো!

পাঁড়ে, বিনোদ ডাকল, গ্যারেজ্ খোলো!

২৩

গাড়িতে যখন বিনোদের পাশে সুরমা উঠে বসল তখন কিশোরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। গাড়ি বেরিয়ে গেল।

জনবহুল পথের ভিড় এড়িয়ে গাড়িটা একটু ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করল।—আমাকে কি যেন বলবে? বিনোদ প্রশ্ন করল।

সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে কিছু বলতে আমি আসি নি, তোমার জবাবটাই শুনতে এসেছি। সুরমা বলল।

কিসের জবাব?

কথা দিয়ে না হলেও আমার এতদিনের কাজ দিয়ে যা বলেছি তার কোনও জবাবই কি আমি আশা করতে পারি না?

হাতটা বিনোদের কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে সুরমা বিনোদের দিকে শরীরটা ছেড়ে দিল। বিনোদ শক্ত হয়ে বসল।

কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না, বিনোদ বলল।

তুমি আমাকে ভালোবাসো এমন আমার মনে হয় না। কিন্তু তোমার আমাকে ভালো লেগেছিল এ তো মিথ্যে নয়। তাই তুমি আমাকে একেবারে ভুলে গেলে আমি ব্যথা পাই।

সে ব্যথা দূর করবার লোকের তো অভাব নেই। বিনোদ বলল।

সেই কথা ভেবেই কি তুমি আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করছ? সুরমা প্রশ্ন করল।

বিনোদ মৃদু হাসল।

বুঝেছি, সুরমা বলল। তারপর একটু থেমেই বলে চলল, ঐ অচেনা মেয়েটিকে আমি হিংসে করি।

কেন ?

আমার চেয়ে, আমার মতো অনেকের চেয়ে, ও তোমার মনে বেশি দাগ রেখেছে।

ও ৺রসিকলাল ঘোষ-নাম শুনেছ বোধ হয়—একজন খুব ভালো সংগীতজ্ঞ গুণী লোক, তাঁরই মেয়ে।

ঘোষমশাইয়ের নাম শুনেছি। তোমার মুখে শুনেছি তুমি তাঁর একজন ভক্ত। কিন্তু শুধু তাঁর মেয়ে বলেই কি তুমি ওদের এত যত্ন করছ ?

ওর মা, রসিকবাবুর স্ত্রী,—আর ওর ছোটভাই, এরাও—

—তোমার ওখানেই রয়েছেন দেখলাম। কিন্তু কেন ?—

রসিকবাবুর অবর্তমানে তাঁর সংসারে—

কোনও রকম কষ্ট অসুবিধে হ'তে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কেন বলছ একথা জানো ? সুরমা বলে উঠল।

কেন ? বিনোদ চাইল সুরমার দিকে।

ঐ মেয়েটি তোমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, তাই।

গাড়িটা মোড় ঘুরল। সুরমা গড়িয়ে পড়ল বিনোদের দেহের ওপর। তার উদ্বেল যৌবনের কোমল স্পর্শ আছড়ে উঠল বিনোদের শরীরে।

বিনোদ কিন্তু হাসল। বলল, গম্ভীর রেখাপাত করেছে বলছ। কিন্তু কি করে করল?

সেইটা বুঝতে পারছি না বলেই তো আমি ভয় পাচ্ছি। ও তো আমার চেয়ে সুন্দরী নয়। আমার চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সম্প্রতি তুমি অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছ, আমি জানি। তাই ভাবছি, আর ভয় পাচ্ছি।

—আর জুলুম করছ আমার ওপর। এমন করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ।

আমি প্রত্যহের নই, আমি আকস্মিক। আমি দাবি করি না, ভিক্ষে চাই। কাজেই আমাকে বিমুখ তুমি ক'রো না। ভালো রেস্তোরাঁয় বা বারে যাই নি অনেক দিন। আজ নিয়ে চলো।

চলো।

গাড়ি মোড় ঘুরল।

২৪

রেস্তোঁরার একটি নিভৃত কামরায় বসে বিনোদ আর সুরমা। প্রাথমিক খাওয়া এদের শেষ হয়ে গেছে। তরলের পালা সুরু হয়েছে এবার। সুরমার উৎসাহ খুব। একটু একটু করে বোতল খালি হয়ে আসছে। বিনোদ কিন্তু মুখে গ্রাস তুলতে পারছে না।

তুমি আজ অভদ্রতা করছ, বিনোদ।

কেন?

একেবারেই খাচ্ছ না।

বলেছি তো আজকের মতো আমায় মাপ করো।

কেন এই কথা বললে সে কথা ভাবছি বলেই যে আমি এত বেশি খাচ্ছি, এ কি তুমি বুঝবে?

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সুরমা। তার শাড়ি অসংবৃত, ব্লাউজের বোতাম এক আধটা খুলে গেছে। নেশায় রাঙা তার মুখের দিকে চেয়ে বিনোদ চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল, আজকের মতো এই থাক্ সুরমা।

সুরমা বলল, না তোমাকে আর আমি পাব না। মাতাল হবার মতো টাকাও জুটবে কিনা জানি না। তোমার সামনে মাতাল হবার লোভ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না, বিনোদ। আমাকে তুমি বাধা দিয়ো না।

কিন্তু তুমি বাড়ি যাবে কি করে?

সেজন্যে ভেবো না। মেয়েমানুষের নেশা হ'লে বাড়ি পৌঁছে দেবার সঙ্গীর অভাব হয় না।

কিন্তু সুরমা, তুমি জানো না—

—দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জানি। কারণ বহুবার আমি মাতাল হয়েছি এবং বহুবার আমার সঙ্গীরা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। তুমি শুনবে তাঁরা কি করেন?

না না, থাক্!

না না শোনো না। লজ্জা কি! তাঁরা কেউ তোমার মতো নন্। নিশ্চিন্ততা নেই তাঁদের মধ্যে। ভয় বা ব্যস্ততা তাঁদের এত ব্যাকুল করে যে বড্ড খাপছাড়া লাগে আমার। সব তাতেই এমন তাড়াতাড়ি। আমার কতগুলো ব্লাউজ ওদের হাতে ছিঁড়েছে জানো—ভালো ভালো ব্লাউজ্—

থাক্ সুরমা ওকথা। তুমি বরং এটুকু খেয়ে নাও—

তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর চটে গেছ? ঠাট্টা করছ নিশ্চয়ই?

না না, ঠাট্টা করিনি। এই নাও।

কিন্তু যদি একেবারে বেহুঁস্ হয়ে পড়ি?

ভয় পেয়ো না। আমি বাড়ি পৌঁছে দোব।

সহস্র ধন্যবাদ তোমাকে। মা জেগে বসে থাকবে, কিংবা হয়তো ঘুমোবে। তুমি আমাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবে। আমি যদি একেবারে বেহুঁস্ হয়ে পড়ি তাহ'লে তুমি আমাকে গাড়ি থেকে দুহাতে তুলে নিয়ে মার কাছে দিয়ে আসবে তো?

হ্যাঁ। তা দিয়ে আসব।

তাহলে আমি বেহুঁস্ হয়েই পড়ি—

মদের বোতলটা থেকে বেশ খানিকটা ঢালল গেলাসের মধ্যে। অন্য কিছু না মিশিয়েই সেটা খেয়ে নিল ঢক্ ঢক্ করে।

এইবার ওঠো, বিনোদ বলল।

আমার এখনও হুঁস্ আছে বিনোদ, সুরমা বলল। কিন্তু বিনোদ, তুমি বলতে পারো আমার বাবা এমন হঠাৎ মারা

গেলেন কেন? বেশ তো পেন্সন্ পাচ্ছিলেন তিনি। আর যেই বা মারা গেলেন অমনি সঙ্গে-সঙ্গে এমন ওলট্ পালট্ হ'ল কেন? টাকা পয়সার কষ্ট কি কোনদিন আমরা জানি না। না আমি, না মা।

তাই তো!

আরে ভ্রান্তি দেখ! শাঁসালো মক্কেলকে বিয়ে করব এই লোভে কাজকর্ম কিছু শিখলাম না। পয়সাওলা জামাই করব এই ভেবে মা রটালেন মিছে করে যে লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কে তাঁর নামে অন্ততঃ হাজার ষাটেক টাকা আছে।

এই কথা রটিয়েছিলেন?

নয়তো কি অত ঘোষ-বোস-দে-দত্তের দল আমার সঙ্গে প্রেম করত অম্‌নি অম্‌নি?

তা ঐ মুখে বিয়েটা—

সেরে ফেলবার ইচ্ছে আমার ছিল। কিন্তু বরাত খারাপ। বাবার মৃত্যুর পর মা ব্যাকুল হয়ে অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন জানালেন তাঁর হবু জামাই দত্তকে।

কোন্ দত্ত?

বিজন দত্ত—মোটরের সেল্‌স্‌ম্যান্।

বেশ তো।

বেশ তো নয়, সুরমার হেঁচ্‌কি উঠল। সুরমা আরও খানিকটা ঢালল গ্লাসে। তারপর ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেলল। বেশ তো নয়। মাকে জেরা করে ও জানল যে লয়েড্‌স্

ব্যাঙ্কে ওঁর হাজার টাকার বেশি জমা নেই—অন্য ব্যাঙ্কেও আর কোথাও কিছু নেই—আমাদের আর কিছু নেই—কোথা থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই—পাশবুক্ দেখে ও নিঃসন্দেহ হ'ল। বুঝল, যে আমাকে বিয়ে করলে ও টাকাকড়ি তো কিছুই পাবে না, উল্টে আমার সঙ্গে আমার মাকেও ওকে প্রতিপালন করতে হবে।

তাই কি ও বিয়েটা ভেঙে দিল ?

শুধু বিয়েটা ভেঙে দিলে তো বাঁচতাম। ও সকলকে বলে বেড়াল আমাদের আর্থিক দৈন্যের কথা যার ফলে আমার বিয়েই হল না !

বড্ড অভদ্রতা করেছে।

তাতেও আমি দুঃখ করি নি। তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল। বুঝলাম তোমার আমাকে ভালো লেগেছে। হয়তো একদিন দুজনে এক হব এই আশায় দিন কাটাতে লাগলাম। পরিশ্রম করা, উপার্জন করার দিকে মন দিই নি। আজ তোমার ভালো লাগার মধ্যে ছেদ পড়ে বড্ড বেশি, তাই চেষ্টা করতে হয় অপর লোকের যাতে ভালো লাগে আমাকে। একাজ ভালো জানিও না, ঠকি প্রায়ই। দুঃখ ঘোচে না একেবারেই।

কোনও চাকরি-বাকরি করছ না কেন ?

ঐ তো বললাম। নিয়মমত কাজ করার অভ্যেস আমি হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমাকে বিলাসী আর আরামপ্রিয় করে দিয়েছ। বিনোদ, বলতে পারো তোমার কেন শুধু

আমাকে ভালো লাগল, কেন তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারলে না ?

কথাগুলো সুরমার মুখে জড়িয়ে গেল। তার মাথাটা টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ল। হাতটা টেবিল থেকে পিছলে ঝুলতে লাগল। সেই সরে-আসা হাতের ধাক্কায় কাঁচের গ্লাসটা বোতলটা পড়ে গিয়ে ঝন্ঝন্ করে উঠল।

বিনোদ আস্তে আস্তে উঠে এসে সুরমার কপালে হাত দিল। শরীরটা তুলল টেবিল থেকে। চেয়ারের ওপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। বয় এলো। বিনোদ বিল দিয়ে দিল।

সুরমার দেহ দুহাতে করে নিয়ে বিনোদ এগোল। বয়টা তার আগে আগে দরজা খুলে দিতে দিতে চলল। মাঝখানের ঘরে যে কজন খদ্দের ছিল তারা একবার চেয়ে দেখল মাত্র। রোজকার ঘটনা। নতুন কিছুই নেই।

গাড়ির পেছনের সিটে সুরমাকে শুইয়ে দিয়ে বিনোদ দরজা দুটোতে চাবি দিয়ে দিল। নেশার ঝোঁকে দরজা খুলে বাইরে না গড়িয়ে পড়ে। তারপর সামনে এসে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বয়টা একটা দীর্ঘ সেলাম দিল। ভারি খদ্দের। আজকাল এত কম আসছে কেন ? এবার থেকে রোজ আসবে হয়তো !

২৫

গাড়িটা বিনোদ ফুটপাথ ঘেঁসেই দাঁড় করাল। সামনে সুরমাদের ফ্ল্যাট্। গাড়ির দরজার চাবি খুলে সুরমাকে তুহাতের ওপর তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সুরমাদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে যখন বিনোদ দাঁড়াল তখন সে হাঁফাচ্ছে। সুরমা লাফ দিয়ে নামল তার হাত থেকে।

বলল, কেমন ঠকিয়েছি! আমি বেহুঁস্ হইনি একটুও।

বিনোদ হাসল। বলল, তাহ'লে তো ভালো।

সুরমা ডাকল, মা মা, দেখ কে এসেছে!

ভেতর থেকে সুরমার মার গলা পাওয়া গেল। কে এসেছে আবার?

বিনোদ। অতিপ্রিয় অতিপুরাতন বিনোদ—হঠাৎ টলে উঠল সুরমা।

পাছে পড়ে যায় এই ভয়ে বিনোদ ধরে ফেলল সুরমাকে।

সুরমা টক্ করে তুবার গলায় আঙুল চালিয়ে দিল। তারপরই ফিরে বিনোদের গায়ের ওপর হড়্হড়্ করে বমি করে দিল। মদের গন্ধে বিনোদের জামা কাপড় গোটা শরীর ভরে গেল।

সুরমার মা দরজা খুললেন।

বিনোদ হাসল।

বিনোদকে ধরে নিয়ে এলাম মা, সুরমা বলল। দেখলাম বেচারী একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাই একা ফেলে আসতে ভরসা পেলাম না।

ভালই করেছ। সুরমার মা বললেন। যদি বাড়ি যেতে না পারে তো এখানেই থাকুক। তোমার বাবার পড়বার ঘরটা তো খালিই রয়েছে, সেইখানেই না হয় বিছানা করে দোব।

আমার ঘরেও শুতে পারো তুমি বিনোদ। সুরমা বলল, আমি ন হয়—

না না, বিনোদ বলল। তার দরকার নেই। আমি আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে যাব। সুরমা আজ আমাকে বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছে। আপনার মেয়েকে কি বলে ধন্যবাদ দোব জানি না।

ধন্যবাদ তোমাকে দিতে হবে না। তোমাকে ও একটু অন্য চোখে দেখে আমরা জানি। তোমার ওপর বিশ্বাস আছে আমাদের। তাই ভয় পাই না।

আচ্ছা আসি, বিনোদ বলল।

একটা কথা ছিল বিনোদ, সুরমার মা বললেন।

বলুন।

ভেবেছিলাম তোমাকে ডেকে পাঠাব। তা তুমি এসে পড়লে ভালোই হ'ল। আমার কেই বা আছে, কেই বা দেখাশুনা করে। মেয়েটা তো আমার চেয়েও অপদার্থ। চাল বা আটা কিছুই পাচ্ছি না বাবা—যদি কোনও ব্যবস্থা—

—কালই করব।

আর বাড়িওলার তাগাদা অসহ্য হয়ে উঠেছে, বিনোদ। চার মাসের ভাড়া বাকি। সুরমা বলে উঠল।

—অবিশ্যি ধার হিসেবেই, সুরমার মা বললেন।

নিশ্চয়ই। কালই ব্যবস্থা করব। আসি।

বিনোদ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আগেকার মতোই তার মুখে হাসি।

২৬

বাড়ির সাম্‌নে এসে গাড়িকে আর দাঁড়াতে হ'ল না। পাঁড়ে জেগেই ছিল। ফটক খুলে দিল। সোজা গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিয়ে বিনোদ গাড়ি থেকে নামছে, মধু এসে দাঁড়াল। নাক সিঁটেকোল। বলল, যা ভেবেছি তাই।

বিনোদ জবাব দিল না। তার অফিস ঘরে ঢুকল।

মধু গেল পেছনে পেছনে। বলল, ভেবেছিলাম ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন একটু। এখন দেখছি ভগবানও অভাগার সঙ্গে রসিকতা করেন। আশা দিয়ে নিরাশ করেন।

চান করব, মধু।

এটুকু জ্ঞান যে আছে সেটাও তাঁরই দয়া। নইলে যা খোসবাই বেরোচ্ছে গা থেকে—

মধু গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে চলে গেল।

২৭

টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন তারাকিংকরী—পাশে কিশোরী। বিনোদ চান করছে, এখুনি খেতে আসবে।

বিনোদ এলো না, মধু এলো। বলল, বাবু বললেন আপনারা রাত জেগে মিছিমিছি কেন কষ্ট পাচ্ছেন। শরীর খারাপ হবে। শুয়ে পড়ুন।

সে কি! বিনোদ খাবে না? তারাকিংকরী জিজ্ঞাসা করলেন।

ওঁর খাবার আপিস ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। ওখানেই খাবেন। আপনারা শুয়ে পড়ুন।

সে কি কিশোরী, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!

উনি হয়তো বড় ক্লান্ত মা—কিংবা কোনও অসুবিধে হবে—

আমার সাম্‌নে বসে খেতে ওর অসুবিধে হবে! আমি ওর মার বয়সী, আমার সাম্‌নে লজ্জা কি! তাছাড়া সন্ধ্যেবেলায় চা-জলখাবার খেল—

তখন অসুবিধে ছিল না, এখন হয়তো আছে। চলো মা, আমরা শুইগে।

কি জানি বাপু, বলে তারাকিংকরী কিশোরীর সঙ্গে শোবার ঘরের দিকে এগোলেন।

মধু বিনোদের খাবার নিয়ে গেল।

২৮

পরদিন সকালে মধুই জাগাল বিনোদকে। বলল, চা নিয়ে এসেছি।

হাত মুখ ধুয়ে বিনোদ এসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক্ দিয়েছে, বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, ভেতরে আসতে পারি ?

আসুন।

কিশোরী এলো। মধু বেরিয়ে গেল।

একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না ?

না। বলুন।

আমরা যে আপনার গলগ্রহ হয়ে পড়লাম—

আপনি কি ভাবছেন যে আমি আপনাদের গলগ্রহ মনে করছি ?

না হলেও দেখুন, আমরা তিনটি প্রাণী—খরচপত্র তো আছে।

তা আছে।

সবই তো আপনার ঘাড়ে ?

খরচপত্রের খানিকটা ভার কি আপনি নিতে চান ?

যদি সম্ভব হয়।

কি ভাবে সম্ভব হবে বলুন। আমি যেটুকু পারি আপনাকে সাহায্য করব। বিনোদ বলল।

আমার জন্যে যদি কোনও একটা চাকরি—

—বেশ। দশটার সময় চান খাওয়া করে তৈরি থাকবেন। বেরোবেন আমার সঙ্গে। দেখব, আপনার বরাতে কিছু লাগে কি না।

মা বলছিলেন, এত খরচপত্র করে এত আসবাব ছবি-টবি—

খরচটা ঠিক আপনাদের জন্যে করিনি। মামা-মামী হঠাৎ এসে পড়তে পারেন, তাঁদের জন্যেও ঘর দোর সাজিয়ে রাখতে হ'ত।

জামা-কাপড়, খেলনা এতগুলো—

বিলগুলো সব আপনার কাছে পেশ করব। আপনি টাকাটা আমাকে দিয়ে দেবেন। চা খেয়েছেন?

না।

খেয়ে নিন্ গে।

কাল রাত্তিরে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট—

কাল রাত্তিরে? না। মধু থাকলে তো আমার কোনও কষ্ট হয় না।

বিনোদ মুখ তুলে চাইল।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিশোরী বেরিয়ে গেল।

২৯

বেলা এগারোটার সময় মিত্র-বোস এণ্ড কোম্পানি, জেনারেল অর্ডার সাপ্লাই অফিসের সাম্‌নে বিনোদের গাড়ি থামল। বিনোদ নামল, কিশোরীও।

ভেতরে যেতে দরওয়ান-বেয়ারা প্রভৃতি বিনোদকে সেলাম করল। বিনোদ সোজা প্রাইভেট্ মার্কা-দেওয়া ম্যানেজারের কামরায় চলে গেল। কিশোরী ইতস্ততঃ করছিল। তাকে বলল, আসুন!

বিনোদ ঢুকতেই একটি ভদ্রলোক, পরণে সুট্, একরাশ কালো দাড়ি, চেঁচিয়ে উঠলেন, এসো ভায়া, এসো! কাল গোটা দিন ছিলে কোথায়? একেবারে পাত্তাই নেই।

কেন বলো তো দাড়িদা? আমার অদর্শনে তুমি এত ব্যাকুল হলে কেন? কোন খবর আছে?

আছে বইকি। তোমার মামা চিঠি লিখেছেন। চাল এখন ছাড়া হবে না। আরও দাম উঠুক্।

তবে তাই উঠুক্। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। তাঁর নুন্ খাই, কাজেই তাঁর পাপের ভাগী হতেই হবে। তা শোন। তোমার একটি প্রাইভেট্ সেক্রেটারি চাই বলেছিলে না? এনেছি।

প্রাইভেট্ সেক্রেটারি—আমার!

লজ্জা কিসের দাড়িদা, বিনোদ চোখ টিপল। প্রাইভেট্ সেক্রেটারি চেয়েছ। মেয়ে হলে চলবে না এমন তো কথা

নেই। তা তুমিই একটা চিঠি করে দিয়ো। মাইনে দেড়শো, মাগ্‌গী ভাতা চল্লিশ, যাতায়াত গাড়িভাড়া দশ। আর শোনো, বলেই বিনোদ একটা স্লিপ্‌ টেনে নিয়ে তার ওপর একটা ঠিকানা লিখল। বলল, এই ঠিকানায় দুমণ চাল আর একমণ আটা কি ময়দা যা হয় পাঠিয়ে দিয়ো। আর, বলে বিনোদ চেক্‌ বই বের করে একখানা চেক লিখল। সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এটাও পাঠিয়ে দিয়ো, দাড়িদা।

চেকটা দেখে ভদ্রলোক হাসলেন! বললেন, এ তো দেখছি সেই পুরাতনী।

আমি চললাম, বলে বিনোদ বেরিয়ে গেল।

৩০

কিশোরী অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইল সেই দাড়িওলা ভদ্রলোকটির দিকে।

ভদ্রলোক কিশোরীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। বললেন, অবাক্‌ হচ্ছেন, না? অবাক্‌ হবার কিছু নেই। ও এই রকমই। আপনার নামটি কি বলুন তো?

কুমারী কিশোরী ঘোষ।

আচ্ছা, দাঁড়ান্‌ এক মিনিট—ভদ্রলোক ছোট্ট টাইপরাইটারটি টেনে নিলেন। কোম্পানির চিঠির কাগজে একটা চিঠি তার

কার্বন-কপি সমেত টাইপ্ করতে লাগলেন। বললেন, আপনার ঠিকানাটা কেয়ার অফ্ বিনোদই করে দিই, কি বলেন?

কিশোরী মুখ তুলে চাইল।

ভদ্রলোক বললেন, আমার কথা শুনে রাগ করলেন না তো?

না। কেয়ার অফ্ বিনোদবাবুই করে দিন ঠিকানাটা।

পড়ে দেখুন—বলে চিঠিটা ভদ্রলোক কিশোরীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

সব ঠিক আছে তো?

কিশোরী বলল, হ্যাঁ।

সই করুন্ তাহ'লে।

উভয়েরই সই করা হয়ে গেল।

আপনার টাকাকড়ি কিছু অগ্রিম দরকার কি? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

না।

আপনার নাম জেনে নিলাম। আমার নামটাও আপনাকে বলা উচিত। আমার নাম সমীর—সমীর চৌধুরী, তবে এই দাড়ির কল্যাণে দাড়িদা নামেই আমি খ্যাত।

আপনি দাড়ি রেখেছেন কেন?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্যে নয়। আমার একবার ইরিসিপ্লাস হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। নিজে ভালো ক্ষুর টানতে জানি না। রক্তারক্তি হয়

প্রায়ই। তাই ঐ ঝঞ্ঝাটই আর রাখিনি, ভদ্রলোক বললেন। তা যদি কিছু মনে না করেন, বিনোদের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ ?

দিন তিনেক।

তা বেশ। তা আমার একজন লোক দরকার ছিল—কতকগুলো কাজের ভার দোব তার ওপর। আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে। দেখুন, এই চালের কারবার করে আমাদের কোম্পানি। অবিশ্যি এই কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে আরও পাঁচটা ব্যবসার সঙ্গে আমার যেমন যোগ আছে এই চালের ব্যবসার সঙ্গে তেমনি যোগ আছে। আমার কিন্তু ধারণা, এভাবে এ কারবার চালানো ধনীদের অন্যায়। আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। একই কলেজে বিনোদ আর আমি লেখাপড়া করেছিলাম। ও আমার কয়েক ক্লাস নিচে পড়ত। তা ও আমাকে কিছুতেই ছাড়ল না। বলল, আগে তুমি প্রমাণ করো দাড়িদা যে আমরা যে ব্যবসা করছি তা অন্যায় ; তাহ'লে হয় তোমাকে ছেড়ে দোব, আর নাহয় মামাকে বলে এ কারবারই আমি বন্ধ করে দোব। সত্যি কথা বলতে কি অফিসের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এই থীসীস্ লেখবার কাজ করতে হচ্ছে। বিনোদকে, বিনোদের মামাকে, আর সেই সঙ্গে দেশের সমস্ত ধনীদের বোঝাতে হবে যে এই ভাবে ব্যবসা চালানো সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। সেই জন্যে একটা বড় গোছের প্রবন্ধ অনেক কিছু তথ্য-সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে

আমাকে লিখতে হবে। সেই কাজে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তো ভালো হয়। অবিশ্যি আপনার যদি ভালো না লাগে তাহ'লে আপিসের অন্য মামুলি কাজও আমি আপনাকে দিতে পারি।

না। আমার এই কাজই ভালো লাগবে।

তাহ'লে ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বসুন। খাতাপত্র সব কিছু ঐখানেই আছে। আজ থেকেই কাজ আরম্ভ হোক্।

৩১

এখনও খাওনি, মা?

মধু এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল। তারাকিংকরী ভেতরে একখানি পিঁড়ির ওপর বসে। সুবল খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে।

তারাকিংকরীর চমক ভাঙল। বললেন, বিনোদ তো এখনও খেতে এলো না।

দুটো বেজে গেছে, মা। আজ আর সে আসবে না। বাইরেই কোথায় খেয়ে নেবে। তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ?

অমন হীরের টুক্‌রো ছেলে এমন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আমার বড় কষ্ট হয়, মধু।

কষ্ট তো আমাদেরও হয় মা, কিন্তু করি কি বলো? ওকে শাসন করা শিবের অসাধ্যি। আর তা করলে ফলও হয়

খারাপ! চটেমটে একসা করে। তার চেয়ে ও নিজে যা করে তাই ভালো। আমাদের ও একরকম সয়ে গেছে। তুমিও ভাবনা-চিন্তা বেশি ক'রো না, মা। ও-সব ঠিক হবে'খন।

তোমাদের মামাবাবু-মামীমা কি শীগ্‌গির আসবেন?

তাঁরা বড়মানুষ, তাঁদের আসা না-আসার কি কিছু ঠিক্-ঠিকানা আছে মা? হুট্ করতে এলেন, হুট্ করতে গেলেন—ওঁদের ব্যাপারই আলাদা।

কাল রাত্তিরে বিনোদের খাওয়া হয়েছিল?

হবে না? অমন অমৃতের মতো রান্না! ও পেট ভরেই খেয়েছিল। তবে তোমাদের সাম্‌নে খেতে এলো না, পাছে তোমাদের সামনে রেখে ওকে আমি বকি, এই ভয়ে। তোমরা সামনে থাকলে ও তো আর আমাকে কিছু বলতে পারবে না। চিরকাল এই রকম দুষ্টু, দেখছি তো। তা তুমি আর ওসব ভেবে মন খারাপ ক'রো না, মা। বেলা পড়ে আসছে। চাট্টি মুখে দাও।

৩২

সাতটা বাজল, অথচ বিনোদের দেখা নেই। দাড়িদা ইচ্ছে করেই অফিস বন্ধ করল না। কারণ বিনোদ টেলিফোন করে বলেছিল যে আসবে। মেয়েটিকে নিজে বাড়ি পৌঁছে দিতে চায় বোধ হয়। দাড়িদার দাড়িও আছে, বয়সও হয়েছে। নব্য তরুণের মনোবেদনার কারণ হতে চায় না। কাজেই এটা সেটা কাজের ভার চাপিয়ে কিশোরীকেও আট্‌কে রেখেছে।

কিশোরী অফিসে থাকতে কেরানিকুলের কর্তব্যপ্রীতি বেড়ে গেছে। তারাও কেউ বাড়ি যেতে চায় না। টাইপরাইটারগুলো এত খাটছে যে মনে হ'ল ভেঙেই বা যায়।

বিনোদের পথ চেয়ে চেয়ে দাড়িদা যখন হতাশ হয়েছে, তখন ঢুকল সুরমা।

বিনোদ বাবু আছেন? বলে সুরমা দাড়িদার ঘরে এসে উপস্থিত। কিশোরীকে কাজ করতে দেখে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

গম্ভীর হবার চেষ্টা করে শ্রীসমীর চৌধুরী ওরফে দাড়িদা বললেন, বিনোদ! কৈ, নেই তো!

আসবেন নিশ্চয়ই এখুনি? সুরমা জিজ্ঞাসা করল।

বলেছে তো আসবে। কিন্তু ওর কথার দাম কিই-বা বলো? দাড়িদা বললেন।

ওর কথার দাম আছে বৈকি দাড়িদা, মেয়েটি টেবিলের ওপর বসে বলল। ওর কথার দাম আছে বৈকি! কাল

রাত্তিরে, তা গভীর রাত্তির হবে তখন, গায়ে আবার তখন ওর মদের গন্ধ ভুরভুর করছে, মনে করুন সেই অবস্থাতেও আমাকে কথা দিয়েছিল, দাড়িদা---আর সেই কথাগুলো ও রেখেছে। সুরমা ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে মুখে পাউডারটা বুলিয়ে নিল।

দাড়িদা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে সুরমার পাশে দিলেন। বললেন, চেয়ারে বোসো।

সত্যিই বড় অন্যায় আমার। অফিসে এসে টেবিলের ওপর বসাটা অভদ্রতা, মনেই থাকে না। সুরমা নেমে বসল চেয়ারটার ওপর।

আপনার সামনে ঠোঁটে রং মাখলে রাগ করবেন না তো? সুরমা বলল।

রাগ করতে যাব কেন? দাড়িদা জবাব দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে যথেষ্ট সৌন্দর্য দিয়েছেন। সেটাকে জ্বলন্ত করবার জন্যে ফালতু পয়সা খরচ করবার তোমার দরকার কি?

দরকার আছে বৈকি, দাড়িদা। ঈশ্বরের দেওয়া সৌন্দর্য যদি যথেষ্ট হ'ত তাহ'লে আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি হতাম আমি। কিন্তু তা তো হয়নি। সুরমা লিপ্‌স্টিক্ বের করে ঠোঁটে লাগাতে লাগল।

দাড়িদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তোমার আকাঙ্ক্ষা তো বড় কম। মাত্র আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি হতে চাও?

বাইরে থেকে দেখতে আকাঙ্ক্ষাটি খুব ছোট হলেও আসলে আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি হওয়ার গুরুত্ব বড় বেশি। কলঙ্ক বা কুৎসার আঁচড়টি লাগবে না, অথচ খেলা পুরোদমেই চলবে। আপনি বলুন দাড়িদা, হিংসে হয় না ?

সুরমার কথাবার্তা শুনে কিশোরী ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছে। দাড়িদা বুঝেও ঘাবড়ালেন না। হেসে বললেন, বেশ তো! আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারিকে নাহয় আমি কিছুদিন ছুটি দিচ্ছি। তুমি তার জায়গায় কাজ করো।

ভুল হ'ল দাড়িদা, সুরমা খটাস্ করে ভ্যানিটি ব্যাগটা বন্ধ করতে করতে বলল। আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি তো আপনি পছন্দ করেন না, করে বিনোদ। আমি বেশ বুঝছি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার সুযোগ আমার এসেছিল এবং তা চলে গেছে। সে সুযোগ আর ফিরে পাব না।

এতটা মুষড়ে পড়ছ কেন ? চেষ্টায় কি না হয় ?

আপনিও আমাকে ঠাট্টা করছেন, দাড়িদা ?

আমার এই দাড়ি নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারি ? চা খাবে ? দাড়িদা বললেন।

না। বিনোদকে খাবার নেমতন্ন করতে এসেছি। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছুজনে একসঙ্গে চা খাব।

আমি বাদ ?

সময় সময়কালে আপনি তো চিরদিনই বাদ, দাড়িদা। ও তো পুরণো কথা। ওতে আর আপনার ছুঃখ কি ?

দাড়িদা, বিনোদ ঢুকল। কি ব্যাপার? এখনও আপিস খুলে বসে আছ?

তোমার জন্যে। তুমি আসবে বললে যে!

লোকজন কেউ বাড়ি যায় নি? বিনোদ প্রশ্ন করল।

যাবে কি করে? দাড়িদা বললেন। আমার নবনিযুক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারির একটা চৌম্বক শক্তি নেই?

তাঁর সে শক্তি যে পূরোমাত্রায় আছে এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হলাম, বিনোদ। নইলে এই অসময়ে তুমি অফিসে আসো? সুরমা উঠে দাঁড়াল।

সুরমা যে! বিনোদ চম্‌কে উঠে বলল।

হ্যাঁ। আজ তোমার চায়ের নেমন্তন্ন। মা ডেকেছেন। গিয়ে কি বলব? আসবে না।

না। গিয়ে বলো যে আসছি।

কত দেরি হবে?

ঘণ্টাখানেক।

আমি কি অপেক্ষা করব?

না, সুরমা। অফিস এখুনি বন্ধ হবে। তুমি বাড়ি যাও।

আচ্ছা। সুরমা হাত দুটো হতাশার ভঙ্গিতে নাড়ল।

এঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে, দাড়িদা—আজকের মতো? কিশোরীকে দেখিয়ে বিনোদ দাড়িদাকে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ।

তাহ'লে আসুন—বিনোদ বলল কিশোরীকে।

কিশোরী দাড়িদাকে নমস্কার করে বিনোদের সঙ্গে এগোল।

বিনোদ আর কিশোরী বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটারগুলোতে ঢাকা পড়বার শব্দ কানে আসতে লাগল। কেরানিকুল বাড়ি যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন।

কিশোরীর ছেড়ে-যাওয়া চেয়ারটায় গিয়ে বসে সুরমা মুখ তুলে চাইল দাড়িদার দিকে। বলল, নতুনের কাছে পুরাতনের চিরকাল পরাজয়ই হয়ে আসছে, না দাড়িদা ?

পুরাতন যদি সত্য হয় তাহ'লে তার পরাজয় হয় না, দাড়িদা কোট পরতে পরতে বললেন।

সেইটা বুঝি বলেই তো নিজেকে এত খেলো মনে করি, দাড়িদা। সত্য কি বিদায় নিয়েছেন আমার জীবন থেকে ? নইলে পদে পদে আমার এমন পরাজয় হবে কেন ? সুরমার স্বর বেদনায় ভারি হয়ে উঠল।

সুরমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে টুপিটা পরতে পরতে দাড়িদা বললেন, সত্য আছেন তোমার জীবনে লুকিয়ে। তাঁকে তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। তাই তোমার মধ্যে এত ভয়, এত সংশয়। কিন্তু এ সংশয় থাকবে না, এ ভয় কেটে যাবে একদিন। সেদিন অবিশ্যি জীবনকে আজ তুমি যে চোখে দেখছ সে চোখে দেখবে না। তবে এটুকু উপলব্ধি করবে যে কোনও জীবনই যেমন ব্যর্থ হয় না, তেমনি তোমার জীবনও ব্যর্থ হয় নি.

দাড়িটাতে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে দাড়িদা বললেন, চলো।

সুরমা উঠল।

৩৩

গাড়িতে উঠে কিশোরীর স্তব্ধ গম্ভীর মুখখানা দেখে বিনোদ ভাবনায় পড়ল। বিশেষ ভাবনায় পড়ল এইজন্যে যে সুরমা মেয়েটি কে, এ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই কিশোরী দেখায় নি। কাল রাত্রে বিনোদের সকলের সামনে খেতে না-যাওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্যই এই মেয়েটি করেনি। আজ সকালে উপার্জনের উপায় সম্বন্ধে বিনোদের পরামর্শ নেওয়ার ভেতরে চাপা অভিমান হয়তো ছিল, কিন্তু তা এতই গোপন যে তা নিয়ে কোনও কথা বলতে বিনোদের সাহস হয়নি। অবিশ্যি সুরমা নতুন এমন কি খবর বিনোদের সম্বন্ধে কিশোরীকে দেবে যা কিশোরী জানে না। বিনোদের সমস্ত দুষ্কৃতির মাঝখানেই হঠাৎ একদিন কিশোরীর আবির্ভাব হয়েছিল। কি ছিল এই মেয়েটির মধ্যে যা বিনোদকে তার নিজের আচরণের সম্বন্ধে মনে মনে লজ্জিত করে তুলেছে, তা ও ভেবে ঠিক্ করতে পারছিল না একেবারেই। তবে এইটা উপলব্ধি করে বিনোদ বিশেষ রকম ক্ষুব্ধ বোধ করছিল যে বিনোদের কিশোরীকে ভালো লেগেছে কি লাগে নি এ নিয়ে কিশোরী মাথা ঘামায় নি মোটেই।

সুরমার কিন্তু তা নিয়ে কি দুশ্চিন্তা! বিনোদ কি সুরমাকে ভুলে গেছে এই ভেবে সুরমা অনবরত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। জোর করে বিনোদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে কি

বাড়াবাড়িটাই না করল সুরমা। অর্থ-সাহায্য প্রয়োজন হলে একটি কথাতেই সুরমা তা পেয়ে এসেছে বরাবর। বিনোদের সামনে এই ভাবে নিজেকে নিয়ে ছেলেখেলা করবার কোনও প্রয়োজনই সুরমার ছিল না।

কিশোরীর গম্ভীর মুখ দেখে. বিনোদ চিন্তিত হয়ে উঠল। সুরমার আবির্ভাবে কিশোরী বিনোদের মনোভাব সম্বন্ধে যদি সজাগ হয়ে ওঠে, এমন কি অভিমান বা হিংসাও প্রকাশ করে. তাহলেও বিনোদ অসুখী হয় না। কিন্তু কিশোরীর মনোভাব কি অবহেলিত প্রেমের স্তব্ধতা প্রকাশ করছে? একটি আবছা অবজ্ঞার হাসি যেন ফুটে উঠেছে কিশোরীর চোখে মুখে। বিনোদ আরও চিন্তিত হয়ে উঠল।

বলল, রাস্তাঘাট চিনে রাখুন। কাল থেকে আপনাকে তো একাই আপিসে যাতায়াত করতে হবে। গাড়ি তো সব সময় বের করতে পারি না পেট্রলের অভাবে।

কিশোরী বলল, আচ্ছা।

বাড়ির সামনে কিশোরীকে নামিয়ে দিয়ে বিনোদ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

৩৪

সুরমা রাগ করতে চেষ্টা করেও রাগ করতে পারল না। কেন পারল না এটা ভেবে ও অবাক হ'ল। বিজন দত্ত আবার এসেছে! সেই বিজন দত্ত যে তার মায়ের টাকা নেই জেনে তাকে বিয়ে করতে পেছিয়ে গেল, আর শুধু তাই নয়, সকলকে তার আর্থিক অনটনের কথাটা জানিয়ে দিয়ে তার কষ্টটা আরও বাড়িয়ে দিল।

চায়ের যোগাড় সমস্ত রয়েছে দেখে ঘরে ঢুকেই বিজন বলল, এক কাপ চা দেবে নাকি? এবং সুরমার জবাব শোনবার আগেই চা ঢেলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কেকেও দিল এক কামড়। সুরমা চেয়ে চেয়ে দেখল।

বিজন চাইল সুরমার দিকে। সুরমা চুপ করে আছে দেখে বলল, খুব কমে যাবে না খাবারদাবার। যাকে নেমন্তন্ন করেছ তার তো কোনও অভাব নেই। আমি ক্ষুধার্ত আজ—আমার সেবায় না হয় কিছুটা লাগুক্।

খাও, সুরমা বলল।

তোমার মত পেয়েছি, এবার একটু প্রাণ খুলে খাই।

বিজনের সত্যিই ক্ষিধে পেয়েছে। এরকম গোগ্রাসে খাচ্ছে কেন? পোষাকটাও ছিঁড়ে গেছে, ময়লা হয়েছে। ওর কি আয়টায় তেমন হচ্ছে না? এই দুঃসময়ে ওরই বা কাটছে কেমন? একবার সুরমা ভাবল জিজ্ঞাসা করে। তারপরই

থেমে গেল। বিজন দত্তের মতো সর্বনেশে লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না করাই ভালো।

কিন্তু টেবিলে যা খাবার ছিল সবই তো খেয়ে ফেলেছে বিজন। সত্যিই ক্ষিধে পেয়েছে বেচারীর। সুরমা চলে গেল ভেতরে। আরও কিছু খাবার নিয়ে আসছে, মা বললেন, বিনোদ এসেছে নাকি ?

না।

তবে কে এলো ? খাবার নিয়ে যাচ্ছিস্ ?

বিজন।

কেন ? তার এখানে আসবার দরকার কি ? তুই থাক্ এখানে—আমি তাড়িয়ে দিয়ে আসছি।

বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে খুব। যা খাবার ছিল সবই খেয়ে ফেলেছে। ক্ষিধের সময় আর তাড়িয়ো না। খেয়ে নিক্। তারপর আসতে বারণ করে দিলেই হবে।

সুরমা চলে গেল।

ছেলেটাকে ছুচোখে দেখতে পারি নে, সুরমার মা বললেন।

ছেলেটা কিন্তু পরম উৎসাহে খাচ্ছিল সুরমার মায়ের হাতের তৈরি নোন্তা খাবারগুলো। সুরমা আরও খাবার নিয়ে পৌছতেই বলল, চলে যাব কি ?

কেন ?

তোমার মা জেনেছেন আমি এসেছি ?

হ্যাঁ।

তাহ'লে যাই।

না, না, খেয়ে নিয়ে তবে যাও।

দরকার নেই। খেতে খেতেই বিভ্রাট বাধিয়ে দেবেন হয়তো একটা। তার চেয়ে বরঞ্চ পকেটে করে এক-আধটা নিয়ে যাই।

না না, তুমি খেয়ে নাও। মা এখন এদিকে আসবেন না।

ভরসা কি?

আমি বারণ করে এসেছি।

বিজন চাইল সুরমার দিকে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালে। তারপর আবার খাওয়ায় মন দিল।

সুরমা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। চা ঢেলে দিল এক কাপ।

—তুমি ভাবছ আমি লজ্জা পাচ্ছি না কেন? কিন্তু লজ্জা পাবার মতো মন আমার আর বেঁচে নেই।

সুরমা মুখ তুলে চাইল।

তোমার টাকা নেই, তাই তোমাকে বিয়ে করলাম না, কারণ তোমাকে খাওয়াতে পারব এ রকম রোজগার আমি করি না—

বিজনের কথা শেষ হবার আগে সুরমার মা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, রোজগার করোনা, বিয়ে করো নি, ভালো কথা। কিন্তু যে-কথা আমি বিশ্বাস করে তোমাকে বলেছিলাম সে-কথা তুমি দুনিয়াভোর লোককে বলে বেড়ালে কেন?

কাজটা বড়ই অন্যায় করেছি. বিজন দাঁড়িয়ে উঠে বলল। কিছু খাবার দু'পকেটে ভরে নিয়ে সুরমার মার দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, আর বসলে আপনি রাগ করবেন, তাই যাচ্ছি। খাবারগুলো রাস্তায় খেতে খেতে যাব। তা কাজটা আমি অন্যায় করেছি, সত্যি! কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে লোককে এরকম অন্যায় মাঝে মাঝে করতে হয়। দেখুন, যে আপনার টাকাকে ভালোবাসে, আপনার মেয়েকে ভালোবাসে না, সে আপনাদের টাকা নেই শুনলে আর আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে না। এ কথা লোককে বলে আমি শুধু এইটুকু করতে পেরেছি যে, আমার মতো কোনও উপার্জনে অক্ষম, আমারই মতো কোনও অপদার্থ ছেলে আপনার তথাকথিত সঞ্চিত অর্থের লোভে আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে না। কারণ, একথা ঠিক যে সুরমাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। তাকে প্রতিপালন করবার শক্তি যেদিন আমার হবে সেই দিনই তাকে আমার পত্নী হবার জন্যে অনুরোধ করতে আমি আসব। আমি শুধু চাই, যে আমার চেয়েও কোনও অক্ষম লোক, যে সুরমাকে ভালোও বাসে না, সে যেন আপনার অদূরদর্শিতার ফলে মিথ্যা মোহে পড়ে আপনার মেয়েকে বিয়ে করে তার জীবনটা নষ্ট না করে। তাই আমি এতবড় একটা অভদ্রতা করেছি। তবে আমি বিশ্বাস করি যে আজ আপনি আমাকে যতই গালাগাল দিন, একদিন আমার এই কাজকে আপনি সমর্থন করবেনই। চলি।

বিজন এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনোদ ঢুকল।

হ্যাল্লো বিনোদবাবু, বিজন বলে উঠল, আপনার পথ চেয়ে চেয়ে সুরমা তো পথে বসবার উপক্রম করেছে। এত দেরি কখনও করে? আসুন, আসুন, বসুন। দেখুন, আজ বড় ক্ষুধার্ত ছিলাম। আপনার জন্যে তৈরি খাবার প্রায় সবগুলোই খেয়ে ফেলেছি। তা ভয় নেই। আবার এঁরা তৈরি করে দেবেন। আমি চলি। একটা কথা। এঁরা কেউ আমায় নেমন্তন্ন করেন নি। বরং ক্ষুধার তাড়নায় আমিই অযাচিত আজ হঠাৎ এসে পড়েছি।

এসেই যখন পড়েছেন, বিনোদ বলল, তখন খানিকটা বসে যান্।

না। আজ থাক্। ভরসা দিলে আপনার বাড়িতে গিয়ে নাহয় আপনার নেমন্তন্ন রক্ষে করব। কিন্তু আজকের এখানকার কর্মসূচী আমি ওলটপালট করে দিতে চাই না। চলি, বিনোদবাবু।

একটা খাবার পকেট থেকে বের করে কামড়ে খেতে খেতে বিজন চলে গেল।

ছেলেটার মাথায় ছিট আছে বোধ হয়—সুরমার মা বললেন।

কেন? বিনোদ জিজ্ঞাসা করল।

বড্ড গোলমেলে কথা বলে। সব বুঝতে পারি না। তা যাক্ গে। তুমি বোসো, বিনোদ। আমি এখুনি তোমার জন্যে খাবার ভেজে আনছি।

সুরমার মা চলে গেলেন। বিনোদ দাঁড়িয়ে। সুরমা কোনও কথা বলছে না।

কি ভাবছ? বিনোদ বলল।

ভাবছি, তুমি কি ভাবছ। সুরমা জবাব দিল।

যা সত্য তাই ভাবছি। ভাবছি বিজন দত্ত সত্যিই তোমাকে ভালোবাসে।

অর্থাৎ আমাকে সত্যি সত্যিই জানিয়ে দিতে চাও, যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না? সুরমা জবাব দিল।

একটু চা ঢালো সুরমা, বিনোদ বলল, আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে।

৩৫

বিনোদের বাড়িতে আসতে হবে এ ধারণা দাড়িদার ছিল না। কিন্তু বাড়ি গিয়ে যখন দেখলেন যে কতকগুলো জরুরি চিঠিতে বিনোদের সই করানো হয় নি, তাছাড়া কর্মচারিদের মাইনে দেবার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে—সে চেকেও বিনোদের সই করানো হয়নি, তখন বিনোদের বাড়ি একবার তাঁকে আসতে হল। অবিশ্যি সন্ধ্যেবেলায় বিনোদকে বাড়িতে পাওয়া যায় না তিনি জানেন। আর যে কাজটুকু আছে তা পরের দিন সকাল বেলায় এসে করিয়ে নিলেও চলত, তাও দাড়িদার অজানা নয়। তবু যে দাড়িদা সেদিন সন্ধ্যে-

বেলাতেই বিনোদের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন এটা নিশ্চয়ই তাঁর কৌতূহল মেটাবার জন্যে নয়। কারণ অতবড় দাড়ি যার তার কৌতূহল থাকে কি করে? কিন্তু বিনোদের সম্বন্ধে চিরকালই দাড়িদা একটু বিশেষ দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। কাজেই গুটিগুটি হাজির হলেন বিনোদের বাড়ি। পাঁড়ে দেখেই একটা দীর্ঘ সেলাম করল। মধু দূর থেকে দেখে দৌড়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল। বলল, আসুন বড়দা।

কিশোরী বারান্দা দিয়ে কি একটা কাজে যাচ্ছিল। দাড়িদাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

দাড়িদা বললেন, আপনি ?

আসুন, আসুন, কিশোরী এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করল।

নতুন সাজানো বসবার ঘরে বসাল দাড়িদাকে।

—ঘরদোর একটু অন্যরকম দেখছি, নারে মধু? দাড়িদা বললেন।

হ্যাঁ। আপনার জন্যে চা করতে বলি, বলে মধু বেরিয়ে গেল।

কেয়ার অফ্ বিনোদ আপনার ঠিকানাটা তাহ'লে ঠিকই লেখা হয়েছে? দাড়িদা বললেন।

ঠিকুটা ঠিক্ ঠিকই আছে কিনা দেখতে এলেন বুঝি? কিশোরী হেসে জিজ্ঞাসা করল।

খুচরো মিথ্যে একটা বলতে পারতাম। কিন্তু বলব না। তাই স্বীকার করছি, সেই জন্যেই এসেছি। কারণ আপনাকে

দেখে বিনোদের সাধারণ মহিলা-বন্ধুর মতো আমার মনে হয়নি। তা আপনি কি এখানে একা ?

না। আমার মা আছেন, ছোট ভাই আছে।

ওঃ।

হ্যাঁ, কিশোরী হেসে বলল। সপরিবারেই আশ্রয় দিয়েছেন আমাকে। সাধারণ বন্ধুদের চেয়ে একটু বেশি মর্যাদা বোধ হয় আমি পেয়েই গেলাম।

শুধু মর্যাদাই পান নি, দাড়িদা বললেন। বেশ বুঝতে পারছি, বিনোদ আপনাকে ভয় করে চলছে। কেন, কিসের জন্যে তা অবিশ্যি আমি জানি না। তবে বিনোদ যে কোনও একটি মেয়েকে ভয় করে চলতে আরম্ভ করেছে এর চেয়ে সুখের কথা আমার কাছে আর কিছুই নেই। অবিশ্যি আমার দাড়িই বেড়েছে, বুদ্ধি নয়! তাই বলছি, বিনোদকে যদি ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যান্ আপনি, তো আমরা খুব সুখী হব। যদিও বুদ্ধি দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। অবিশ্যি আমি জানি সে বুদ্ধি আপনার যথেষ্টই আছে। কারণ, আপনি সাধারণ মেয়ে নন্।

তার মানে আমি অসাধারণ ছল-চাতুরী জানি। কিশোরী হেসে বলল। কিন্তু দাড়িদা, কাউকে চালিয়ে নিয়ে যাবার, কারুর জীবনে পরিবর্তন আনবার সামান্য ইচ্ছাটুকুও আমার নেই। স্রোতের কুটোর মতো আমি ভেসে এসেছি ভিক্ষা অবলম্বন করে। ভিক্ষা আমি পেলাম, নিতেও বাধ্য হলাম।

অবশ্য ভিক্ষাটা খুব ভদ্রভাবে, আমার আত্মসম্মানকে কোনও রকমেই আঘাত না করে অতি সন্তর্পণে আমার কাছে আসছে। আমিও হাত পেতে সেটা নিচ্ছি। কিন্তু এই ভিক্ষে নিতে বাধ্য হওয়ার জন্যে সুখী আমি নই। এবং এই নেওয়ার শেষ যেদিন হবে, আর হিসেব মিটিয়ে যেদিন আবার পথে বেরুতে পারব সেইদিনই আমি হব সুখী।

বুঝেছি, দাড়িদা হেসে ফেললেন। বিনোদটা চিরকালই একটা চাষা। আপনার মনের কোনও সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ও রূঢ় আঘাত দিয়েছে। আপনার অভিমানের লেজটা ও অসাবধানে মাড়িয়ে ফেলেছে আর কি! তাই আপনার আত্মসম্মানটা হঠাৎ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। তা মন্দ নয়। এরকম মাঝে মাঝে না হ'লে ভালোও লাগে না!

আমি বুঝছি না আপনি কি বলছেন। কিশোরী বলল।

আপনি না বুঝলেও চলবে। দাড়িদা আবার হাসলেন। কিন্তু কৈ? আপনার মায়ের সঙ্গে তো আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না? আপনার ছোট ভাইটিই বা কোথায়? মধু যে বড় গলা করে বলে গেল চা খাওয়াবে, কৈ, তাকেও তো দেখতে পাচ্ছি নে?

আমি দেখছি, বলে কিশোরী বেরিয়ে গেল।

৩৬

একা একা ঘরের মধ্যে বসে দাড়িদা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বিনোদের পক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক—তার বিলাসের সমস্ত উপকরণ, তার অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার আত্মপ্রকাশের নানাবিধ উপায়গুলি, ছোট ছোট মূর্তি থেকে বড় বড় ছবি পর্যন্ত,—এই ঘর থেকে বিদায় করে দেওয়া। দাড়িদা জানতেন এটা বিনোদের মহল। তার মামা-মামী এদিকে ঢুকতেন না একেবারেই। নিজেরা অল্প স্থান নিয়ে সংকুচিত হয়ে থাকতেন, কিন্তু বিনোদের খেয়ালকে তাঁরা ক্ষুণ্ণ করেন নি। বিনোদের পক্ষে নিজের ইচ্ছাকে সংযত করা এই নতুন। এটা অস্বাভাবিক, কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ, বিনোদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করল কে? দাড়িদা জানেন বিনোদ খুব চিন্তাশীল লোক নয়। খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে, কসে হিসেব করে, সংসার একটা মায়া এবং নারী একটি ছায়া—এ উপলব্ধি করবার মতো মানসিক স্থবিরত্ব বিনোদের এখনও হয়নি। অনাবৃত ছায়াকে বিদায় করে ও সুসংবৃত কায়াকে সম্মানের সঙ্গে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিনোদের মনের কোন্ তন্ত্রীতে আঘাত করেছে এই মেয়েটি, যাতে এতখানি সম্মান বিনোদ তাকে দিয়ে ফেলল, দাড়িদা বসে বসে এটাই ভাবতে চেষ্টা করলেন। কারণ, বিনোদ

দয়ালু হলেও ভাবপ্রবণ। ভালো-মন্দ কোনও সংকল্পই ওর মাথায় স্থায়ী আসন পায় না, যদি না কেউ তাকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জিইয়ে রাখে। নারী সম্মানের পাত্রী, পুরুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এই যে শিক্ষা, এ বিনোদকে কি করে দিল এ মেয়েটি? দাড়িদা নড়েচড়ে বসলেন।

৩৭

মাকে নিয়ে কিশোরী যখন ঘরে ঢুকল তখন সে একটি দেখবার মতো চেহারা; এই ভদ্রলোকটিকে জলখাবার খাওয়াতে সে একেবারে বিশেষরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিশোরীর হাতে একখানা কাচের প্লেট—তাতে গরম লুচি সাজানো। তারাকিংকরীর হাতে তরকারির বাটি। মধুর হাতে মিষ্টির প্লেট আর জলের গ্লাস। পেছনে সুবল, দাড়িদার সম্বন্ধে কৌতূহলী, থেকে থেকে আড় চোখে চাইছে।

কি ব্যাপার! দাড়িদা বলে উঠলেন।

ব্যাপার কিছু নয়। একটু জল খান্। চা আসছে।

পাশে ছোট টেবিলের ওপর সমস্ত খাবারগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হ'ল।

কিশোরী পরিচয় করিয়ে দিল, আমার মা

দাড়িদা দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন।

কিশোরী বলল, এঁর নাম শ্রীসমীর চৌধুরী। তবে সকলে দাড়িদা বলেই ডাকে। এঁরই কাছে আমি কাজ করি।

ভাগ্যদোষে আজ আমার মেয়েকে আফিসে কাজ করতে হচ্ছে, বাবা, তারাকিংকরী বলে উঠলেন। ও তোমার বোনের মতো।

আমি ওকে সেই চোখেই দেখি, লুচি একটা মুখে পুরে দাড়িদা বললেন।

বিনোদবাবুর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিলেন। বিনোদবাবু ওঁকে বড়ই শ্রদ্ধা করেন। কিশোরী বলল।

বিনোদ বড় ভালো ছেলে, দাড়িদা বললেন। ওকে আমি অনেকদিন ধরেই জানি।

হ্যাঁ বিনোদ বড় ভালো ছেলে। তবে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে না। তারাকিংকরী বললেন।

ব্যবসাদার লোক. ঘোরাঘুরি করতে হয় বৈ-কি।

কিন্তু তা বলে সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না?

আমরা তো বলে বলে হায়রান হয়ে গেছি। এখন আপনারা বলে-কয়ে যদি পথে আনতে পারেন! এটি কে? আপনার ছোট ভাই? দাড়িদা সুবলকে দেখে বললেন।

হ্যাঁ। কিশোরী বলল। প্রণাম করো, সুবল।

সুবল ভয়ে ভয়ে নমস্কার করল।

দাড়ি দেখে ভয় পেয়ো না, দাড়িদা বললেন। আমি তোমার দাদা হই!

সুবল হেসে ফেলল।

হায়রে দাড়ি! দাড়িদা বললেন, ছেলেরাও এ দেখে ভয় পায় না।

মধু চা নিয়ে এলো। বলল, দাদাবাবু এসেছেন।

বিনোদ এসেছে? এখানে ডেকে নিয়ে আয়। দাড়িদা বললেন।

মধু ডাকতে যাবার আগেই বিনোদ ঢুকল। বলল, কতক্ষণ দাড়িদা? চা-টা খাওয়া হয়েছে। বেশ! বেশ!

তুমিও খাও বাবা, তারাকিংকরী বললেন। দুপুরবেলায় কি খেয়েছ না খেয়েছ কিছুই তো জানি না।

দিন, বলে বিনোদ দাড়িদার পাশেই বসে পড়ল।

কিশোরী চা ঢেলে দিল।

মার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, দাড়িদা? বিনোদ জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ।

তোমাদের আশ্রয়ে এসে যে কত নিশ্চিন্ত হয়েছি বাবা, কি করে বলব, তারাকিংকরী বললেন। কর্তা চোখ বোঁজবার পর ঐ মেয়ে নিয়ে কি করব এই ভেবেই তো আমার বুক শুকিয়ে যেত। তার পরে এই ঘোর আকাল। পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, বাবা। তোমরা আশ্রয় দিলে। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন্।

থাক্ থাক্ ওসব কথা। দাড়িদা তুমি বোধ হয় জানো না, তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি খুব ভালো গান জানেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ওঁর বাবা ছিলেন ৺রসিকলাল ঘোষ। বাংলা-দেশে ওরকম গুণী খুব কমই ছিলেন।

তাহ'লে তো গান একটা শুনতে হয়—দাড়িদা বললেন।

হার্‌মোমিয়াম্‌ তো ঐখানেই রয়েছে—বিনোদ দেখিয়ে দিল।

কিন্তু—কিশোরী বলল।

কিন্তু নয়, কিন্তু নয়! গান আমাকে আজ শোনাতেই হবে। নইলে কাল অফিসে গেলে ডিক্সনারি কপি করতে দোব।

তোমার নামটি যেন কি বাবা ?—তারাকিংকরী বললেন।

আমার নাম সমীর—দাড়িদা জবাব দিলেন।

আজ রাত্তিরে তুমি এখানেই খাবে, সমীর। আমি রান্নাঘরে চললাম। সব তৈরি করতে আমার দেরি হবে না মোটেই।

আচ্ছা।

তারাকিংকরী চলে গেলেন।

কিশোরী চুপ করে বসে রইল।

কৈ ? দাড়িদা বলে উঠলেন। একটু আলাপ হোক্‌। বিনোদের মুখে যখন শুনলাম আপনি চমৎকার গান জানেন তখন না শুনে তো উঠব না।

কিন্তু গান শোনবার ইচ্ছেটা কি আপনারই হয়েছে ? কিশোরী জিজ্ঞাসা করল।

কেন ? আর কারুর ইচ্ছে হ'লে কি তারা শুনতে পারে না ? বিনোদ বলল।

বুঝেছি, দাড়িদা বলে উঠলেন। আর কারুর ইচ্ছে হয় তাঁরা শুনবেন, না ইচ্ছে হয় শুনবেন না। সে সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তবে আমার ইচ্ছে হয়েছে গান শোনবার। আমি অতিথি। আমাকে বিমুখ করবেন না।

কিশোরী উঠে গিয়ে হার্‌মোনিয়ামে বসল।

দাড়িদার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। অবিশ্যি দাড়ি থাকা সত্ত্বেও যতখানি হতে পারে। ভাবখানা এই, কতবড় একটা প্রেম-কলহ নিবারণ করলুম, দেখ!

কিশোরী গাইল,—

অন্ধ রাতের স্তব্ধ পথের ধারে,
বন্ধু, তোমার স্নিগ্ধ প্রাণের আঁখি,
সহসা মেলিলে, ঝলকি উঠিল আলো,
হৃদয় আমার শিহরিল থাকি থাকি!
মরণের ঝড়ে কালের রক্ত-রাখী
উড়ে এলো, সবে বাঁধিল দুখের ডোরে;
সে দুখ সজল মুছালে কোমল করে
হেরিনু তোমার স্নিগ্ধ প্রাণের আঁখি।
মৃত্যু যখন রুদ্র গভীর রোষে
তোমারই নিঠুর পরশে সবারে নাশে,
হাসিল তোমার স্নিগ্ধ প্রাণের আঁখি;
হৃদয় আমার ভরে দিল সুরে সুরে!

রান্নাঘরে তারাকিংকরীর কানে এই গানের রেশ গিয়ে পৌঁছল। তিনি বুঝতে পারলেন না, গভীর দুঃখের দিনে তাঁর স্বামী যে গান গাইতেন, আজকের সন্ধ্যায় তাঁর মেয়ে সে গান গাইছে কেন? তাঁর মেয়েও কি আজ দুঃখ পেয়েছে? যদি পেয়েই থাকে তো কে তাকে দুঃখ দিল?

তারাকিংকরী আঁচলে চোখ মুছলেন।

৩৮

বিনোদ চলে গেছে অনেকক্ষণ। কিছুই সে বলে নি। সুরমা যা বলেছে তার জবাব দেয় নি ভালো করে। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছিল। নেমন্তন্ন রেখে চলে গেছে। সুরমার মা বেশ খুশিই হয়েছেন। বিনোদ ছেলেটি নিরহংকার, এই তাঁর ধারণা। কিন্তু সুরমা সে কথা কি করে বিশ্বাস করবে? সুরমার মনের কথা যার মনে শুধু আছাড় খেয়েই ফিরে আসে সে লোক কি অহংকারী নয়? কিন্তু কিসের এই অহংকার? কি পেয়েছে বিনোদ যে সুরমা আজ তার কাছে কিছু নয়? এই কথা ভাবতে গিয়েই সুরমার চোখে জল এলো।

সুরমার মা তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। ফ্ল্যাটের দরজা এখনও খোলা আছে। সুরমা এখনও জেগে বসে আছে। বিনোদ কি ফিরে আসবে না? মুহূর্তের জন্যেও কি ফিরে আসবে না? মনে কোনও আঘাত পেয়েও কি সে

ফিরবে না? সুরমার বুকের মধ্যে কেন জানি না কান্না ঠেলে উঠল। অনাদরে পড়ে থাকা গ্রামোফোন্‌টা ও বার করল। রেকর্ড চালাল একখানা। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে শিক্ষিত কণ্ঠে ভেসে উঠল মধুর গানের সুর, কত মিনতিমাখা, তা সুরমা আজ বুঝল। গান চলছে,—

গাছে যে ফুল ফোটে তারে নেয় না যে কেউ তুলে
তারে নেয় না যে কেউ তুলে,
কেমন করে বাঁচবে সে আর যদি সবাই থাকে ভুলে,
তারে সবাই থাকে ভুলে।

বাতাস এসে ঘোরায় ফেরায়
আলো শুধু উঁকিই যে দেয়,
আঁধার আবার তারেই লুকায়,
নেয় না যে কেউ তুলে;
তারে নেয় না যে কেউ তুলে।

সুরমার মনের মধ্যে যে কান্না আজ গুম্‌রে উঠছে তা এই স্তব্ধ রজনীতে রূপ নিল যন্ত্রের মধ্যে বন্দী এই মধুর কণ্ঠস্বরের অপরূপ মূর্ছনায়। কিন্তু লোকে তো শুধু রেকর্ডের গানই শুনবে। যে কান্না সুরমার মনের মধ্যে অশান্ত আলোড়নে পাক্‌ খেয়ে মরছে তা কি কানে ঢুকবে কারুর? বিনোদ! বিনোদ তো চলে গেছে, না জানি কতক্ষণ হ'ল।

সুরমার মা ও ঘর থেকে বলে উঠলেন, এত রাত্তিরে আবার রেকর্ড নিয়ে বসলি, সুরমা? খেতে না চাস্, শুয়ে পড়্। এমন ভাবে রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।

এই যাচ্ছি— বলে সুরমা উঠল।

যাচ্ছ ঠিক্ কিন্তু ওদিকে নয়—খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে বিজন বলল।

সে কি! তুমি? এত রাত্রে? সুরমা এগিয়ে গেল বিজনের দিকে।

হ্যাঁ আমি। বিজন চাপা স্বরে বলল। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ কলের গান শুনছিলাম। বিনোদ চলে গেছে বুঝি? আর আসে নি?

সুরমার চাপা কণ্ঠস্বরে আগুন ঠিক্‌রে উঠল। তুমি মদ খেয়েছ?

অল্প একটুখানি। বিজন জবাব দিল। বেশি আর কে খাওয়াবে বলো? তা ও গান শুনেই শেষ করলে তো তোমার চলবে না, সুরমা। বলে টলতে টলতে বিজন গ্রামোফোনটার কাছে গেল। গ্রামোফোন্‌টায় কসে দম দিল। সুরমা সরিয়ে নিল রেকর্ডগুলো। বলল, বাজাতে হবে না।

কিন্তু শুনতে তোমাকে হবেই, বিজন চাপা গলায় বলল। তারপরই গলা ছেড়ে গান ধরল,—

ওগো পারের দেশের মেয়ে,

আমি পরীর দেশের ছেলে,

সকল পরীর সেরা তুমি,
তোমায় যাব ফেলে,
এমন বোকা—নইতো আমি পরীর দেশের ছেলে।

ওগো পরের দেশের মেয়ে,
নিজের দেশে চলো এবার, পরীর দেশে ওগো,
বাতাস যেথায় চামর বুলায় সূর্যি বলে, জাগো।
সেই দেশেতে মেঘের ঘরে জ্বল্‌বে সাঁঝের বাতি,
হাসবে তারা, দেখবে যে চাঁদ জ্বলছে সারারাতি।
তোমায় আমায় সেই দেশেতে বলবে না কেউ, মাগো!
পরের দেশের মেয়ে, চলো পরীর দেশে ওগো!

বিজন গান গাইতে পারত এক সময়। রেডিওতে গাইত। রেকর্ডও করেছিল এক আধখানা। কিন্তু এত দুঃখেও ওর গলায় এতখানি মাধুর্য বেঁচে আছে কখনও ভাবেনি সুরমা।

—বিনোদ তোমায় কখনও এম্‌নি করে ডাকবে না, সুরমা। তুমি চলো। আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবে চলো।

না। তুমি যাও। সুরমা চাপা গলায় বলল।

ওর মনের ওপর যে স্বপ্ন চেপে বসতে চাইছিল ও তাকে জোর করে ঝেড়ে ফেলেছে। সুরমার কণ্ঠস্বর প্রায় রুক্ষ।

আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, সুরমা। তুমি মাকে বলো যে একটু বেড়িয়ে এখুনি ফিরে আসবে। বিজন কথা বলছে চুপি চুপি। তার স্বর মিনতিতে ভরা।

সুরমা বলল, না। তুমি যাও।

তাহ'লে তুমি আমায় ঘাড়ে ধরে বের করে দাও। নইলে আমি যাব না।

এটা মাতলামোর জায়গা নয়, বিজন। সুরমা ফিস্ ফিস করে বলল। তুমি জানো তোমার ওপর নিষ্ঠুর আমি হতে পারি না। কিন্তু তা নিয়ে দুঃখও তুমি আমাকে দিয়ো না। তুমি যাও।

বেশ।

বিজন গাইতে লাগল। যে গান গেয়েছে একটু আগে তারই সুরের রেশ ধরে গাইতে লাগল,—

জেগে দেখা না পাও যদি স্বপনেতে চেয়ো
পায়ে হেঁটে না যাও যদি মনে মনেই যেয়ো॥

গান গাইতে গাইতে বিজন বেরিয়ে গেল। সুরমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুরমার মা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন বললেন, সুরমা, বেশ গানটি তো! আর একবার বাজা না।

না মা থাক্, রাত হয়েছে।

থাক্ তবে—সুরমার মা বললেন। কিন্তু বিজনের গলা না?

হাঁ। ও তো আগে গ্রামোফোনে গান-টান দিত।

হাঁ। বড় মিষ্টি গলা রে ছেলেটির।

সুরমা চুপ করে রইল।

সুরমার মা আপন মনেই বললেন, থাক্‌গে তাহ'লে।

যা দিনকাল পড়েছে তাতে ঐ সব ছেলেমানুষী গান শুনে লাভই বা কি! আর ঐ হতভাগাটার গান শোনাই বা কেন?

গ্রামোফোন আর রেকর্ডের বাক্সটা হাতে নিয়ে সুরমা ভেতরের ঘরে চলে গেল।

৩৯

অফিসের ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে চলেছে। বাইরে কেরানিদের টাইপরাইটার টক্ টক্ করে যাচ্ছে। ভেতরের ঘরে দাড়িদ তাঁর টেবিলে বসে কাজ করছেন। ওদিকের টেবিলে কিশোরী বসে।

দাড়িদার সামনে দাঁড়িয়ে একজন কর্মচারী। দাড়িদা তাঁকে বললেন, দুশো আটাশ মণ বারো টাকা হিসেবে যা হয় একটা বেয়ারার চেক্ নিয়ে আসুন। আমি সই করে দিচ্ছি। এখুনি ব্যাঙ্ক্ থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসুন, গাড়ি নিয়ে যান্।

কর্মচারীটি চলে গেলেন। দাড়িদার সামনের চেয়ারে বসেছিলেন একজন ভদ্রলোক। দাড়িদা তাঁকে বললেন, আপনি যে মাল তুলে দিয়েছেন তার রসিদ অবিশ্যি আমি পেয়েছি। তবু আমার লোক আপনাকে টাকা দেবার আগে যদি একবার দেখে নেয়, তাতে আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?

না না, কিছুমাত্র নেই।

কর্মচারীটি চেক্ বই নিয়ে ঢুকলেন। দাড়িদা চেক্‌টি সই করে দিলেন। তারপর কর্মচারীটিকে বললেন, দেখুন, আপনি টাকাটা ভাঙিয়ে নিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার আমাদের গুদামে চলে যান্। মালগুলো সব নিজের চোখে দেখে নিন্। যদি ঠিক্ থাকে তো ওঁকে ওখানেই টাকা দিয়ে দেবেন। আর যদি কিছু গোলমাল মনে হয় তো এখানে চলে আসবেন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব। দরওয়ান্ একজনকে নিয়ে যাবেন।

যে আজ্ঞে, কর্মচারীটি বললেন।

নমস্কার, বলে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। দুজনেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দাড়িদা ফিরলেন কিশোরীর দিকে। বললেন, হ্যাঁ, লিখুন, মিস্ ঘোষ। আমাদের শাসনতন্ত্র এই জায়গাটায় একটা বড় ভুল করলেন। প্রকাণ্ড একটা ভুল করলেন চাল বা খাদ্যবস্তু পুরোপুরি ভাবে নিজেদের হাতের মধ্যে না নিয়ে। অবিশ্যি একথা সত্য যে দেশে যা উৎপন্ন খাদ্যশস্য আছে তাতে ঘাট্‌তি হচ্ছে বছরের মধ্যে তিন হপ্তার খোরাক্। একথাও সত্য, যে আশা আছে অন্যান্য প্রদেশ থেকে খাদ্যশস্য এ প্রদেশে আমদানি হতে পারে। কিন্তু সরকারের একথা ভুলে যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়, যে ব্যবসায়ের যে কোনও জিনিস নিয়ে ফাট্‌কা খেলা ধনীদের একটা বিরাট দুর্বলতা বা তাদের অস্তিত্ব বজায়

রাখবার একটা প্রধান অস্ত্র। এ সম্পর্কে ধনীদের মানবতার ওপর নির্ভর করাটা একটি শোচনীয় মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। অতএব খাদ্যবস্তুর ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে সরকারের হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া উচিত ছিল।

আরও একটু ভুল করছেন সরকার। সাধারণকে জানতে দিচ্ছেন না দেশে খাদ্যবস্তুর কিছু অনটন আছে এবং খাদ্যবস্তু বেশি লাভের আশায় সঞ্চিত করে রাখা এ অবস্থায় মহাপাপ, সামাজিক অনিষ্টকর কাজ এবং বে-আইনি। তাঁদের আইন করে খাদ্যবস্তু সঞ্চিত করে রাখা বে-আইনি ঘোষণা করা উচিত। তা না করে এখনও তাঁরা আশা করছেন যে বাজারের সাধারণ লেনদেনের ভেতর দিয়ে চালের দাম কমে আসবে। তা আসবে না। কারণ, কালো বাজারের লাভের টাকার রস ধনীরা ভালো করেই পেয়েছেন এবং খাদ্যবস্তু তাঁরা মজুদ করে রাখবেনই বেশি দাম পাবার আশায় এবং বেশি দাম যে তাঁরা পাবেনই এটা তাঁরা কষে দেখে নিয়েছেন।

সবচেয়ে দুঃখ এই যে সরকারের এই দুর্বল নীতির ফলে বহুলোকের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে, অথচ সেদিকে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দিচ্ছেন না। খাদ্যবস্তুর দাম সাধারণ লোকের কেনবার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবার দরুণ অন্নাভাব ভয়ানক বৃদ্ধি পাবে। যে দুর্ভিক্ষ হবে,—এবং আশঙ্কা হয় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করা হলেও দুর্ভিক্ষ হবেই যদি এইভাবেই এগিয়ে যাওয়া যায়—তো সেই দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের

জন্যে যতখানি ঘটবে, তার চেয়ে বেশি ঘটবে মানুষের অমনোযোগিতা, লোভ এবং স্বার্থপরতার জন্যে। এই কথা আজকের দিনে আমাদের মতো সামান্য লোকের মুখ দিয়ে বেরোলেও একদিন জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও তা স্বীকার করবেন। সরকারও বুঝতে পারবেন তাঁদের ভুল। কিন্তু সেই ভুল বুঝতে যতই তাঁদের দেরি হবে ততই বেশি সংখ্যক লোকের জীবন বিপন্ন হতে থাকবে।

কিশোরী মাথা হেঁট করে লিখে যাচ্ছিল। বিনোদ ঘরে ঢুকল। বলল, দাড়িদা—

হ্যাঁ বলো।

পাঁচশো মণ। সাড়ে আট টাকায়।

মাল তুলে দিয়েছে ?

হ্যাঁ।

কত নম্বর গুদামে ?

পাঁচ নম্বরে।

দেখে নিয়েছ ?

হ্যাঁ।

কাকে টাকা দিতে হবে ?

বিনোদ ডাকল, আসুন, আসুন।

একটি ভদ্রলোক ভেতরে এলেন।

দাড়িদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাড়ে আট করে পাঁচশো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব'সো বিনোদ। বসুন আপনি। ক্যাশ্ আনিয়ে দিচ্ছি। লিখুন মিস্ ঘোষ,—দরিদ্রের প্রাণ ভারে ভারে আজ সঞ্চিত হচ্ছে ধনীর ঘরে ঘরে। ধনীদের লোভের চাপে গরীবদের প্রাণ যখন বেরোতে থাকবে, তখন দেশের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে যে ধ্বংসের ঝড় উঠবে তার মধ্যে থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে আনা হয়ে উঠবে এক দুষ্কর ব্যাপার। শাসনতন্ত্রের আজকের এই অমনোযোগিতা ভবিষ্যতে তাঁদের পুনর্গঠনের এই বিরাট্ দায়িত্বের সাম্‌নে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। আজকের অমনোযোগিতার সঙ্গে সেদিন যদি আসে অকর্মণ্যতা তাহ'লে সমস্ত ভবিষ্যৎই হয়ে উঠবে অন্ধকার।

থ্রী চিয়ার্স ফর্ দাড়িদা—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে !—বিনোদ বলে উঠল।

৪০

দুপুর বেলাটা তারাকিংকরীর কাটতে চায় না। দেউড়িতে পাঁড়ে ঘুমোয়। রান্নাঘরের পাশে মাদুর বিছিয়ে মধুও তোফা দিবানিদ্রা দেয়। সুবলও বল্ নিয়ে খানিকটা লাফালাফি করে আর বই নিয়ে খানিকটা গুঁই গাঁই করে ঘুমিয়ে পড়ে। তারাকিংকরীর চাল ডাল বেছে দুপুর বেলাটা আর কাটে না। দিনে ঘুমোনো ওঁর অভ্যেস নেই। একখানা রামায়ণ কি

মহাভারত পেলেও খানিকটা পড়তেন বসে বসে। ভাবছিলেন কিশোরীকে বলবেন একখানা যেন নিয়ে আসে। এমন সময় এলো সেদিনের সন্ধ্যের সেই মেয়েটি।

গেট ভেজানো ছিল, সেটা ঠেলেই ভেতরে চলে এলো সাম্‌নের বারান্দায় বসেছিলেন তারাকিংকরী। সুবলের সার্টে একটা বোতাম লাগাচ্ছিলেন। তারাকিংকরীকে দেখে মেয়েটি হাত জোড় করে নমস্কার করল। বলল, আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?

তারাকিংকরী বললেন, না, না, বিরক্ত করবে কেন মা? কিন্তু বিনোদ তো বাড়িতে নেই।

আমি আপনারই সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অবিশ্যি যদি আপনি ব্যস্ত থাকেন—

না না, ব্যস্ত আর কোথায় মা? একা একা বাড়িতে থেকে হাঁপিয়ে উঠি। বিশেষ এই দুপুর বেলাটায়। চলো মা। ভেতরে গিয়ে বসবে চলো।

ভেতরে গিয়ে মেয়েটি বলল, সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি। বড়ই অন্যায় করেছি। আমার নাম সুরমা। আপনার মেয়ের মতো আমিও পিতৃহীন। আমি আর মা। একটি ভাইটাইও নেই।

কি করবে মা? এসব তো মানুষের হাত নয়। তা ব'সো। একটু জিরিয়ে কিছু মুখে দাও। ঘণ্টা দুঘণ্টার ভেতরে ওরা এসে পড়বে।

তা বসছি। আপনাকে কিন্তু একদিন আমাদের বাড়ি যেতেই হবে মাসিমা।

তার আর কি মা? নিয়ে গেলেই যাব। তুমি একটু ব'সো। আমি চায়ের জল চড়িয়ে আসি।

না না, এখানে একা একা বসে থাকতে ভালো লাগবে না, মাসিমা। তার চেয়ে চলুন, আমি রান্নাঘরের বাইরেই বসে থাকব। বাইরে বসে বসেই আপনার সঙ্গে গল্প করব।

কেন? ভেতরে গিয়েই বসবে'খন।

না না। সাত সহর এক করে আসছি। এই কাপড়ে আর রান্নাঘরে ঢুকব না।—বলে জুতোটা খুলে রেখে সুরমা এগোল। তারাকিংকরীও চললেন রান্নাঘরের দিকে।

৪১

আলুর ছেঁচকি দিয়ে খানকতক লুচি খেয়ে চা খেতে খেতে যা জানবার ছিল সুরমার, তা সবই তারাকিংকরীর কাছে সে জেনে নিয়েছে। তারাকিংকরীর কথা, তাঁর স্বামীর কথা, কিশোরীর কথা, কিশোরীর কাকা-কাকিমার কথা, তাদের কলকাতায় আসার কথা—সবই। ওঠবার আগে সুরমা একটু হেসে ব'ল, আপনাকে দুঃখু দিতে চাইনে মাসিমা, কিন্তু একটা কথা যদি বলি তাহ'লে কি খুবই রাগ করবেন?

তোমার কথায় রাগ করব কেন মা? আর কি-ই বা বলবে যাতে আমি রাগ করতে পারি?

আমার নিজেরই দুঃখের কথা বলব, মাসিমা। গরীবের মেয়ের পক্ষে বড়লোকের ছেলের অনুগ্রহ নেওয়ার বিপদ কতটা তা তো নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছি। বিনোদ-বাবু আর বিনোদবাবুর মতো আরও অনেকেই সেটা বুঝিয়েছেন আমাকে। আমি শুধু ভগবানকে ডাকছি এই বলছি তাঁকে, যে আমার জীবনে যা ঘটেছে আপনার মেয়ের জীবনে যেন তা না ঘটে। কিন্তু মাসিমা, আমার সত্যিকারের দুঃখু এই, যে সব জেনেও আপনি চুপ করে আছেন, সব দেখেও আপনি চোখ বুজে আছেন।

সে কি মা? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

বিনোদবাবুর আপিসে কিশোরীর কাজ করা এটা কি আপনি ভালো মনে করেন?

ভালো-মন্দ তো ভাববার সময় পাইনি মা। আমরা যে তখন ছিলাম নিরুপায়।

এখন তো ভাববার সময় পেয়েছেন।

তা পেয়েছি সত্যি। তারাকিংকরী গম্ভীর হয়ে বললেন। কিন্তু এ ছাড়া উপায় তো আর কিছু নেই মা।

বুঝেছি মাসিমা, কিশোরীও আমার মতো অভাগিনী। আমার মা যেমন সব বুঝেও চুপ করে ছিলেন, আপনিও সব দেখেও চোখ বুজে আছেন। মায়েদের কাছে মেয়েদের

বলবার কিছু নেই। মায়েরাও যেন মেয়েদের কিছু বলতে না আসেন, কখনও যেন কিছু না বলেন।

কিন্তু বিনোদ, সমীর এরা—

বড় ভালো ছেলে। সকলে বলে। কিন্তু আমার মতো অনেক সাক্ষী আছে যে মাসীমা। তারা যে অনেক কিছু জানে।

কিশোরী ঢুকল। ডাকলো, মা।

এই যে কিশোরী।

ইনি? সুরমাকে দেখিয়ে কিশোরী জিজ্ঞাসা করল।

তোর সঙ্গে আলাপ হয়নি বুঝি? এ সুরমা। বলছে যে বিনোদের আপিসে তোর কাজ করাটা ভালো নয়। সকলে না কি মন্দ বলবে। তাহ'লে—

তাহ'লে চলো আবার পথে পথে ভেসে বেড়াই।

মায়ের কর্তব্য করতে গেলে তাই বোধ হয় করা উচিত আমার। সুরমা বলছিল যে তার মা সব বুঝেও চুপ করে ছিল বলে আজ আর তার কোন ভরসা নেই।

যে নিজের মনকে বোঝে না মা, সে তার মায়ের দুঃখ কি বুঝবে? কিশোরী বলল। তোমার মেয়ে যদি অসম্মানের মধ্যেই থাকত মা, তাহ'লে তার সেই অমর্যাদার সাক্ষী হিসেবে তোমাকে তার কাছে থাকতে সে দিত না। তার ছোট ভাইকেও সে কাছে রাখত না। তোমার মেয়ে ভালো না হতে পারে। কিন্তু পূরোপূরী মূর্খও সে নয়।

বিনোদবাবুর সম্বন্ধে সমীরবাবুর সম্বন্ধে, আপনার প্রশংসা-

পত্র লোকে যেমন শুনবে, তেমনি আমাদের মন্তব্যগুলোও তো তারা অগ্রাহ্য করবে না। সুরমা বলে উঠল। আপনি একা সম্মান পাচ্ছেন একি কেউ বিশ্বাস করবে, যখন তারা ভালো রকমই জানে যে এঁদের দেওয়া অসম্মানের স্রোতে আমার মতো অনেকের ভরাডুবি হয়েছে?

আপনি আমাকে সাবধান করতে এসেছেন। সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, কিশোরী বলল। কিন্তু আমার নির্বিরোধী মায়ের মনে এই অশান্তির সৃষ্টি না করলে কি আপনার চলত না?

সুরমা ধীরে ধীরে অতি মিহি স্বরে জবাব দিল, অন্যায় করে থাকি, মাপ করবেন। নিজে আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়েছি, তাই আর কাউকে সেই আগুনের দিকে এগোতে দেখলে বারণ না করে থাকতে পারি না। এটা আমার অনধিকার-চর্চা, আমার অন্যায়। আমাকে মাপ করবেন. আমি চললাম।

সুরমা বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখল সামনে বিনোদ। ও কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, কখন ওদের কথাবার্তা শুনেছিল তা সুরমা বা কিশোরী বা তারাকিংকরী কেউই টের পান নি।

বিনোদ বলল, সুরমা দাঁড়াও।

সুরমা দাঁড়াল। বলল, অপমান করতে চাও করতে পারো আমি আপত্তি করব না। কারণ আমি এখন মান-অপমানের বাইরে। অবিশ্যি তোমারই দয়ায়।

না। তোমাকে অপমান আমি করব না। কারণ যে প্রশ্ন

আজ তুমি তুলেছ, তা একদিন উঠতই, আমি জানি। তাই এর জবাব আজই আমি দিতে চাই।

তারাকিংকরীর দিকে চেয়ে বিনোদ বলল, দেখুন. এ কথা সত্যি যে আপনাদের স্নেহ বা বিশ্বাসের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য। আর একথাও সত্যি যে সুরমা যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে এনেছে, সে রকম অভিযোগ আরও অনেক মেয়ে আমার বিরুদ্ধে আনতে পারে, আনলে অন্যায় হবে না। তবে সমীরবাবুর বা দাঁড়িবার সম্বন্ধে সুরমা যা বলেছে তা সত্যি নয়। সুরমার সব চেয়ে দুর্ভাগ্য যে শত আঘাত পেয়েও যাঁর স্নেহ ওর প্রতি আজও অটুট্ সেই দেবচরিত্র লোকটিকে ও চিনতে পারেনি। আপনার মেয়ের সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার আলাপ হয়েছিল সেদিন আপনার মেয়েকে আমি চিনতাম না। কিন্তু তার পিতার পরিচয় পাবার. আগে তার যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তাতেই আমার মনে পাপ পরাজিত হয়েছিল। এ ঘটনা এ জন্যেই সম্ভব হ'ল যে আপনার মেয়ে সুরমা প্রভৃতিদের মতো নন্। অবিশ্যি আপনি ইচ্ছে করলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আপনার মেয়ে যত দিন আপনাদের সংসারের ভার বহন করবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে না পারেন, ততদিন আপনাদের আমার সঙ্গে না হলেও অন্ততঃ সমীরবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা উচিত। আমি নাহয় অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত করে নেবো। আপনারা এইখানেই থাকবেন।

বিনোদের কথাগুলো শুনতে শুনতে তারাকিংকরী বিমনা হয়ে গেলেন। ফিরে চাইলেন কিশোরীর দিকে। ও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। সুরমার চোখ জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝে। স্পষ্ট বোঝা গেল বিনোদের কথাগুলো সুরমা সহ্য করতে পারছে না। তারাকিংকরী বিনোদের দিকে চাইলেন। বললেন, আমার মেয়েকে আমি বিশ্বাস করি বাবা। তোমাকেও আমি অবিশ্বাস করি না। আমরা যেমন এখানে আছি তেমনি এখানে থাকব। তুমিও যেমন আছ তেমনি থাকবে। আমার স্বামীকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার মেয়েকে আমি ভুল বুঝব না। তুমি যদি অমানুষও হও, বিনোদ, তুমি একজন। শোনা কথায় তেতে উঠে মেয়ের হাত ধরে তাকে হাজার অমানুষের বাজারে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে আমি পারব না। তুমি বলো আমার স্বামী গুণী ছিলেন, তুমি তাঁর ভক্ত। তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি যেন তোমাকে ভদ্র করে রাখে, এই আশীর্বাদই তোমাকে আমি করি।

তারাকিংকরীর কথা শুনে সুরমা মুচকে মুচকে হাসছিল। স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, বলেই ও এগোল। যাবার সময় রসিয়ে বলে গেল, আপিসের কেরানিকে কি কেউ গাড়িতে পাশে বসিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে মাসিমা, যদি সে কেরানি মেয়ে না হয়?

বিনোদ ঘুরে সুরমার দিকে যাচ্ছিল। তারাকিংকরী বারণ করলেন। বললেন, থাক্ বিনোদ। আমি মেয়েমানুষ।

সুরমা কেন এমন করছে তা আমি বুঝতে পেরেছি বাবা। তুমি হাত মুখ ধোও। আমি চা করিগে যাই।

তারাকিংকরী রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

মুহূর্তের জন্যে কিশোরীর মুখের দিকে চেয়েই বিনোদ চেঁচিয়ে উঠল, মধু, তোরা সব থাকিস কোথায়? আমার তোয়ালে কই! মুখ হাত ধোব না? বলতে বলতে বিনোদ নিজেই আপিসঘরের দিকে এগোল।

৪২

ধীরে ধীরে কিশোরী চলে গেল তার বসবার ঘরে। হারমোনিয়াম্‌টার সামনে টুলটার ওপর সে বসে পড়ল। তার এ ক'দিনের অস্তিত্বের চারপাশে শালীনতার যে সূক্ষ্ম মস্‌লিন পর্দা ঝুলে ছিল বিনোদের ভদ্র ব্যবহারে, তার মায়ের কৌতূহলের অভাবে এবং তার নিজের সংহত সংযমের ফলে, তা একটি কুৎসিৎ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গেল ঐ মেয়েটি, ঐ সুরমা। কি লাভ হ'ল তার, তা সুরমাই জানে। কিন্তু মায়ের কাছে এমন অনাবৃত হয়ে কিশোরীর মনটা সাময়িক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বিনোদকে। সে যে কিশোরীকে শ্রদ্ধা করে একথা সে অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করে গেল। কিশোরী যে সুরমা প্রভৃতিদের মতো নয় একথাও বিনোদ বলে

গেল জোর গলায়। কি দরকার ছিল বিনোদের এই অনাবশ্যক প্রশংসা করার ? এই শ্রদ্ধা যে কৃপার নামান্তর তা কি কিশোরী বোঝেনি, না তার মা-ই বুঝতে পারেন নি এই কথা ? তবু এই বাহ্যিক ভদ্র আচরণের মাধুর্যে এত দুঃখের মধ্যেও কিশোরীর অন্তর কোমল হয়ে উঠল। তার চোখের কয়েক ফোঁটা জল পড়ল ঐ হারমোনিয়াম্‌টার ওপর !

২৩

বিনোদ আঘাত করেছে সুরমাকে নিষ্ঠুরভাবে। তার অন্তরের কলুষকে সূক্ষ্ম আবরণে ঢাকা থাকতে দেয়নি। নিজের সমস্ত দুষ্কৃতি স্বীকার করে নিয়ে সুরমাকে অপ্রস্তুত করল বিনোদ। কেন ? কিশোরীর জন্যে। আর কোনও কারণে নয়, সুরমা তা বোঝে। বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল সুরমার। দাড়িদাকে এর মধ্যে না জড়ালেই হ'ত। যদি জড়ানোই হয়ে থাকে তো ক্ষতি কি ? বিষ যখন উদ্‌গার করতে হবেই তখন কাকে তা স্পর্শ করবে আর কাকে করবে না, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? দেবচরিত্র দাড়িদার নামে কলঙ্ক যদি স্পর্শই করে তো ক্ষতি তা করবে না নিশ্চয়ই।

বাড়িতে পৌঁছে সুরমা মাকে বলল, আজই বাইরে যাচ্ছি মা। বিনোদের একটা কাজের জন্যেই যেতে হচ্ছে।

৪৪

মনোমোহিনী দেবীর পূজার্চণার বাতিক বড়ই প্রবল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ও ব্যবসায়ী কিরীটীভূষণবাবু স্ত্রীর সামনে চিরকালই কাবু। কাজেই গৃহিনীর সঙ্গে গঙ্গাস্নানেও তাঁকে আসতে হয়। পুণ্য বারানসীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর বসে জপাদি করুন্ বা না-করুন্ কিছুক্ষন উপবেশন অন্ততঃ করতে হয়। তারপর বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়াটা বাদ দিলে বাড়িতে খণ্ডপ্রলয় অন্ততঃ একটা বাধে। কাজেই বাধ্য হয়ে সেটাও বজায় রাখতে হয়।

ভক্তি বা ধর্ম্মমার্গে কতটা উন্নতি তাঁর হ'ল এ নিয়ে মনোমোহিনী দেবী মাথা ঘামান না। অন্ততঃ সদাচারের গণ্ডীর মধ্যে স্বামীকে আটকে রাখতে পেরেই তিনি সন্তুষ্ট। কিরীটীবাবুও এতে দমবার পাত্র নন্। কারণ কলকাতা থেকে ভাগ্নে বিনোদ চিঠি যদিও সব সময় লেখে না, তবু অফিস থেকে সমীরের মারফৎ কারবারের সব খবরই তিনি পান। কাজেই কত মন চাল তিনি কিনলেন, কি হারে চালের দাম উঠছে এবং কি রকম মোটা টাকা তিনি কামাবেন, এটা সব সময়ই তাঁর মাথায় থাকে। দেবতার সামনে সেই মাথা যখন মাঝে মাঝে নত হয়, তখনও তার মধ্যে মানসাঙ্কের ঝড় প্রবল বেগেই বইতে থাকে। পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক নিয়ে মাথা তিনি

বেশি ঘামান না। কারণ সস্ত্রীক ধর্ম তিনি পুণ্য কাশীধামে আচরণ করছেন এবং স্ত্রীর অর্জিত পুণ্যের একটা মোটা রকমের অংশ তাঁর মিলবে এটা তিনি জানেন। কাজেই নির্ভয়ে ছুটো পয়সা রোজগার করতে তাঁর কোনই বাধা নেই। অবিশ্যি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই তিনি নাস্তিক। শুধু বাতের ব্যাথাটা যখন মাঝে মাঝে বাড়ে অথবা তাঁর ধরে-রাখা কোনও শেয়ারের দাম যখন আচম্‌কা পড়তে থাকে তখনই তাঁর মনটা ভগবদ্ভক্তিতে আঁকু পাঁকু করে ওঠে। তখন তাঁর স্ত্রীর শান্ত গম্ভীর মুখ দেখে তিনি একটু শান্তি পান। বউয়ের আঁচল ধরে বৈতরণী তিনি পার হতে পারবেন এই রকম একটা অস্পষ্ট আশা তাঁর মনে বরাবরই আছে।

সেদিনের কাগজে বাংলাদেশে অন্নকষ্টের বিবরণটা বড়ই মর্মস্পর্শী করে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিরীটীবাবু একটু বিচলিত হয়েও উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। লোকে পরে চামার বলবে। চালগুলো ছাড়াই যাক্। কিন্তু চোখের সামনে যখন দেখলেন স্ত্রী ছু'হাতে ভিখারী-ভিখারিণীদের ডবল পয়সা নয়, সিকি ছু-আনি দান করে যাচ্ছেন, তখন মনটাকে কিরীটীবাবু সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে ফেললেন। টাকা যদি তিনি রোজগার না করেন তো তাঁর স্ত্রী দান করে পুণ্যই বা করবেন কি করে? অবিশ্যি বিনোদ মাঝে মাঝে এক আধখানা বেয়াড়া চিঠি

লেখে। তা লিখুক্। মামা কৃপণ না হলে, চশমখোর না হলে, ভবিষ্যতে বিনোদের যে অসুবিধে হবে এটা তো, ছেলেমানুষ সে, বোঝে না। কিন্তু তা বলে কিরীটীবাবুর তো তাঁর নিজের কর্তব্য ভুলে গেলে চলবে না। ক্ষুদ-কুঁড়ো কিছু সঞ্চয় করে ছেলেপুলেদের জন্যে—ওঃ ছেলেপুলে নেই—তা ঐ ভাগ্নের জন্যেই তো রেখে যেতে হবে? তাতে কতজনের দীর্ঘশ্বাস পড়ল, কি কটা লোক গালাগাল দিল, এ বাছলে তো আর চলবে না?

স্ত্রীর পিছু পিছু পদব্রজে আধুনিক বারাণসীর পীচের রাস্তা অতিক্রম করে কিরীটীবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন দেখলেন একটি তরুণী বৈঠকখানায় তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মেয়েটি উভয়কেই প্রণাম করল। মনোমোহিনী বললেন, তোমাকে তো চিনতে পারছি না, মা।

মেয়েটি বলল, আমার নাম সুরমা। বিনোদবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একটা পার্টিতে। ওঁর সঙ্গে একবার আপনাদের বাড়িতেও আমি গিয়েছিলুম। হয়তো লক্ষ্য করেন নি।

বোধ হয়। তা মা তুমি এখানে এসেছ কতদিন? উঠেছ কোথায়? মনোমোহিনী দেবী প্রশ্ন করলেন।

আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। বেনারসে নামতে হয়েছিল। তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। সুরমা বলল।

তা বেশ করেছ মা। মনোমোহিনী দেবী জবাব দিলেন। বললেন, আজ তাহ'লে এখানেই খাওয়া দাওয়া—

না না, আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। আমার জিনিসপত্র সমস্ত স্টেশনে পড়ে—

তা বিনোদ আছে কেমন? কিরীটীবাবু বললেন। ও মাঝে মাঝে চিঠি দেয়, মাঝে মাঝে দেয় না।

ভালোই তো আছেন। সেই মেয়েটি, ঐ কিশোরী, তার মা, তার ভাই সবাই আছে। ওঁরা বোধ হয় আপনাদের কোনও আত্মীয়ই হবেন। অবিশ্যি আমি সঠিক চিনি না।

কিরীটীবাবু চাইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। মনোমোহিনী দেবী বিশেষ বিচলিত হলেন বলে মনে হ'ল না। সুরমার দিকে চেয়ে বললেন, আজকাল সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কালেভদ্রে কখনও এক জায়গায় জড়ো হয়। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলকে কেউই চেনে না। তবে একটু খুঁজলে পরিচয় ঠিকই পাওয়া যায়। তা যাক্ মা, বিনোদ ভালো আছে শুনে বড় সুখী হলাম। তা তুমি অন্ততঃ একটু জলটল খাও।

জলটল খেয়ে সুরমা স্টেশনে গেল। আর কিরীটীবাবু স্ত্রীকে নিয়ে পড়লেন।

৪৫

বললেন, কি ব্যাপার গো তোমার ভাগ্নের? কি আবার কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে? কে কিশোরী, কেবা তার মা, কেবা তার ছোট ভাই—এক বাড়িতে, এক সঙ্গে—কি ব্যাপার?

তা এত মাথা খারাপ করবার কি আছে? বিনোদ কি এতই ছেলেমানুষ হবে? মনোমোহিনী জবাব দিলেন।

তোমার আঁচলতলায় থেকে সে আর মানুষ হ'ল কবে? ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ বলে আর কত ঢেকে ঢেকে রাখবে? হয়তো গিয়ে দেখব একেবারে অমানুষই হয়ে গেছে।

তুমি যেন ওর ওপর জাতক্রোধ হয়ে আছ বাপু! কে কি বলল অমনি মাথা গরম হয়ে গেল। এমন কানপাৎলা লোক তো আর দেখি নি! মনোমোহিনী মুখঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন।

গণ্ডারের মতো মোটা চামড়া যখন পাইনি তখন কানের পর্দা দুটো না হয় একটু পাৎলাই থাকুক্। আখেরে কাজে দেবে। গিন্নি, ব্যাপারটা যত সহজ করে তুমি দেখছ এটা তত সহজ নয়। মেয়েটি আমাদের দেখবার জন্যে এখানে আসেনি! খবরটা দিতে এসেছিল। আমি বলি কি, চলো কালই কলকাতায়।

কেন?

কেন? নয়তো কি শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি হবে?

কলকাতায় না গেলে তো তোমার শান্তি নেই। লোকের গলায় পা দিয়ে পয়সা ঘরে তুলতে না পারলে তো তোমার দিন কাটতে চায় না। এমন চশমখোর যে অপরকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিশ্চিন্তি নেই। পাছে দু'পয়সা কম আয় হয়। বলি পয়সা তো অনেক হ'ল, এখন একটু ধর্ম কর্মে মন দাও।

আর আমার ধর্ম-কর্ম। চলো দেখি কলকাতায়। কি ব্যাপারটা দেখি গিয়ে।

বাবা বিশ্বনাথকে ছেড়ে—মনোমোহিনী বললেন।

কালীঘাটে মা কালী তোমার জন্যে বসে আছেন। কেন অবুঝ হচ্ছ গিন্নি? চলো কালই। হঠাৎ গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

না না। যদি যেতেই হয়, হঠাৎ যাওয়া ঠিক্ হবে না। বিনোদকে অন্তত: টেলিগ্রাম করে দাও। তারপর না হয় আমরা যাব।

কেন?

কেন তা তুমি বুঝবে কি? যমদূতের মতো লোকের মাথায় ডাণ্ডস্ মারো, আর সংসার করতে বসে কচি খোকার মতো আবদার ধরো। তোমার কি কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে? ধরো, বিনোদের যদি আমাদের কাছে কিছু লুকোবার থাকেই, তো আগে থাকতে সাবধান হতে দেওয়া ভালো নয়? বলি, সংসারে শান্তি কি তুমি কোনও দিন চাইবে না?

ঠিক বলেছ গিন্নি। ওকে টেলিগ্রামই করে দিই।

তাই দাও। তোমার ঐ তেজারতি বুদ্ধি নিয়ে তোমাকে যদি চলতে দিতাম তো আমার বিনোদ অনেক আগেই বিবাগী হ'ত!

৪৬

সুরমার সেদিনকার আচরণ বিনোদের ভালো লাগেনি মোটেই। তারাকিংকরীকে এলোমেলো কথা বলে বিব্রত করা, কিশোরীকে অপদস্থ করার চেষ্টা, ওগুলো অভদ্রতা ছাড়া আর কি?, বিনোদের বিরুদ্ধে সুরমার না হয় কিছু বলবার থাকতে পারে। বিনোদ সেটা শুনতেও প্রস্তুত। কিন্তু বিনোদকে আঘাত করতে গিয়ে ঐ দু'জনকে অপমান করার চেষ্টা করা সুরমার উচিত হয় নি। বিশেষ দাড়িদার সম্বন্ধে ঐ মিথ্যে অপবাদ রটানো। বিনোদ সুরমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। কৈফিয়ৎ চাইবার জন্যে নয়। কেন সুরমা এমন করে বেড়াচ্ছে এইটাই ভালো করে বুঝতে। এসে শুনল সুরমা কলকাতায় নেই।

সুরমার মা বললেন, সুরমার খবর তো তোমার কাছ থেকেই আমার পাওয়ার কথা বাবা। আমাকে বলল, ও তোমার কাজেই বাইরে যাচ্ছে।

বিনোদ অবাক্ হ'ল।

তাকে আরও অবাক্ করে দিয়ে সুরমা ঢুকল। পেছনে কুলির মাথায় মালপত্র।

কুলিকে বিদেয় করে সুরমা বলল, তুমি এসেছ বিনোদ, ভালোই হয়েছে। তোমার মামাকে মামীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা তো কেউই বলতে পারলেন না কিশোরী বা তার মা বা তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তোমাদের সংসারের কোন কুটুম্বিতে বা আত্মীয়তা আছে কিনা। তবে কি জানো, আজকাল সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কালেভদ্রে কখনও এক হয়। ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক সময় পরিচয় বেরিয়ে পড়ে।

কে কিশোরী রে? সুরমার মা প্রশ্ন করলেন।

তুমি চিনবে না, মা, সুরমা জবাব দিল।

তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো? বিনোদ জিজ্ঞাসা করল।

না। কষ্ট আর কি? তবে তোমাকে সঠিক খবরটা এনে দিতে পারলাম না এইটেই দুঃখ।

সে জন্যে দুঃখ ক'রো না। খবর একদিন না একদিন তুমিও পাবে, আমিও পাব। চলি।

বিনোদ উঠল। সুরমা মুচকে হাসল।

৪৭

বাড়িতে আসতেই মধু একটা টেলিগ্রাম দিল বিনোদকে। বিনোদ টেলিগ্রামটা খুলে পড়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। তারাকিংকরী বললেন, কোনও খারাপ খবর নয় তো বাবা?

না, বলে বিনোদ এগোল।

৪৮

শ্রীসমীর চৌধুরী তখন সংখ্যাতত্ত্বমূলক গবেষণায় ব্যাপৃত। বাংলাদেশের আসন্ন দুর্ভিক্ষে কত মরতে পারে এবং কি ভাবে চললে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস করা যায়, এই নিয়ে তিনি অতিশয় ব্যস্ত। কাগজ-পত্র, ম্যাপ, চার্ট অনেক সামনে পড়ে আছে। গড়গড়ায় তামাক পুড়ছে। মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন।

বিনোদ ঢুকেই বলল, দাড়িদা—

কে? বিনোদ? এসো, এসো! দেখ, দেশব্যাপী যদি সাহায্যের জন্যে একটা আন্দোলন করা যায় তাহ'লে অনেক মৃত্যু রোধ করতে পারা যাবে। ধনীদের কিছু করে লাভ ত্যাগ করতে হবে। সরকারের সাহায্যও দরকার এবং আশা করা যায় তা পাওয়া যাবে। শোনো—

ওসব এখন থাক, দাড়িদা। এই দেখ টেলিগ্রাম।

দাড়িদা টেলিগ্রাম দেখে বললেন, ভালোই তো! মামাবাবু-

মামীমা যদি আসেন তো আমাদের সুবিধেই হবে। তাঁদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দোব যে চালের ব্যবসাতে এখন লাভ খাওয়া তাঁদের ঠিক্ হচ্ছে না। এখন নিরুপায় মানুষের প্রাণ বাঁচানোই তাঁদের উচিত।

তা যা বোঝাতে চাও বুঝিয়ো। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে, জানো ?

কি ?

সুরমা গিয়েছিল বেনারসে।

তারপর ?

তারপরই মামাবাবুর এই টেলিগ্রাম।

তাতে কি হয়েছে ?

বুঝতে পারছ না ? সুরমা বলেছে কিশোরীদের কথা।

তাতে কি হয়েছে ? অসহায় একটি মেয়েকে, তার সংসারকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। যে ঘোরতর পাপ তুমি করছ, তার সামান্য ক্ষতিপূরণও এই প্রায়শ্চিত্ত করে হবে কিনা সন্দেহ। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। কাজেই এতে ভড়কাবার কি আছে ?

মামা-মামীমা এসে কিশোরীদের ও-বাড়িতে দেখে কি ভাববেন বলো তো ?

খারাপ কিছু ভাববেন বলে তো মনে হয় না।

কিছু বলা যায় না, দাড়িদা। সুরমা তাদের কি বুঝিয়ে এসেছে তা তো জানি না। যদি হঠাৎ এসে কিশোরীকে

তাঁরা কিছু একটা বলে ফেলেন, তাহ'লে সেটা বড় লজ্জার কথা হবে।

তা অবিশ্যি হবে।

কাজেই কি করব ভাবছি।

ভাবা হয়ে গেলে না হয় ব'লো কি করবে।

ভাবনা-চিন্তা শেষ করেই আমি এসেছি তোমার কাছে। আমি কিছু করব না। তুমিই করবে।

আমি করব? তা বলো কি করব?

কিশোরীদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে রাখবে।

তোমার পাল্লায় পড়ে দেখছি নীলকণ্ঠ নাম্ ধারণ করতে হবে। সুরমাকে তো জানি। বড়ই ছেলেমানুষ। ভালো-মন্দ অনেক কিছুই বলবে বা রটাবে। অবিশ্যি কিশোরীরা আমার এখানে থাকলে আমার চেয়ে তাদের অসুবিধে বেশি হবে। কারণ, আমার ঐ এক উজবুক চাকর তাদের খবরদারি কি রকম করবে তা ভগবানই জানেন। তবে সুরমার রটানো আজেবাজে কথা শুনে কিশোরী না অন্য কিছু ভাবে।

না তা ভাববে না। তোমাকে সে বড়ই ভক্তি করে।

সেই সাহসেই কি তাদের এখানে পাঠাতে চাইছ? কিন্তু ভায়া, এখনও সাবধান করে দিচ্ছি। আমার দাড়ি বাড়লেও বয়স এখনও খুব বেশি বাড়েনি। দমও আছে। প্রেমসাগরে সাঁতার কাটতে এখনও পারি।

আর জ্বালিয়ো না, দাড়িদা ! ওদের কালই এখানে আনবার ব্যবস্থা করো।

চলো। আজ তাহ'লে গিয়ে ওদের আসবার মত করিয়ে আসি।

৪৯

আমার বোন্‌টি কোথায় ? বলে দাড়িদা বিনোদের বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

কিশোরী কি একখানা বই পড়ছিল। বই রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন দাদা, বসুন। আমি মাকে খবর দিইগে।

বিনোদ এসে দাড়িদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিশোরী বিনোদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

দাড়িদা লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। বললেন, নিজবাসভূমে পরবাসী কেন ভায়া ? ব'সো, আমার পাশেই না হয় ব'সো।

এই যে বসি, বলে বিনোদ বসল।

ঝগড়াঝাঁটি করেছিলে নাকি ? দাড়িদা জিজ্ঞাসা করলেন।

না।

তবে ?

তবে আবার কি ! সুরমা !

বুঝেছি। ভাঙিয়াছে হাটে হাঁড়ি। তা তুমি চালাক চতুর

আছ। দু-পাঁচ দিনেই সামলে নেবে'খন। এখন কিশোরীকে তুমি খুব শ্রদ্ধা করছ বোধ হয়, জোর গলায় বলছ ও সাধারণ মেয়ের মতো নয়, আর বলছ ওর সংস্পর্শে এসে তোমার জীবনের ধারা পাল্‌টে গেছে, ভালোর দিকে গেছে।

তুমিও আমাকে বিশ্বাস করো না, দাড়িদা?

করি বৈকি! আর যাতে এই বিশ্বাস চিরকাল বজায় থাকে তাই মাঝে মাঝে তোমাকে খোঁচা দিই, যাতে তুমি তোমার মনের সঙ্গে লড়াই করে তোমার সংপ্রবৃত্তিগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমার এবং তোমার মামার উভয়েরই তো বিবেকরক্ষী! কাজেই মাঝে মাঝে তোমাদের চটিয়ে দিয়ে সজাগ করে না দিলে আমার কর্তব্যের যে ত্রুটি হবে।

তোমার কর্তব্যের ত্রুটি! সে সৌভাগ্য ঘটবে কি আমাদের জীবনে? গালাগাল খেতে খেতে প্রাণটা বেরিয়ে গেল—

কে গালাগাল দিচ্ছে বাবা তোমায়? বলতে বলতে তারাকিংকরী ঢুকলেন।

আমি দিচ্ছি, দাড়িদা বললেন। কেন দোব না বলুন? বিনোদের কি কোনও আক্কেল আছে? আমি আজ কতদিন ধরে বলছি আপনাদের কিছুদিনের জন্যে আমার ওখানে নিয়ে যাব, তা আপনাদের মতটা চাইতে। তা বিনোদের আর সময় হয় না।

আমার মত চাইতে যাওয়ার দরকার দরকার কি, দাড়িদা ? আর তা ছাড়া তুমি নেমন্তন্ন করছ। তুমি নিজে এসে না বললে এঁরাই বা যাবেন কেন ? বিনোদ বলল।

আরে, সেইজন্যেই তো নিজে এসেছি। আর তোমাকেও পাকড়াও করে এনেছি। যাতে আমার আড়ালে মতলব-টতলব দিয়ে ওঁদের মত বদলে দিতে না পারো। তা শুনুন মা, আপনার এই ছেলেটির বাড়িতে দুদিনের জন্যে পায়ের ধুলো দিতে হবে যে !

কিন্তু সে কি করে হবে বাবা ? বিনোদ এখানে—

বিনোদ তবু পদে আছে মা—ওর মধু আছে। যা হয় দুটো রেঁধে খাওয়াতে পারে। আমার তো সেই এক লোট্টন, বিহারের অধিবাসী টিকিধারী মহাপুরুষ—রাঁধেন যা তা মুখে দেওয়া যায় না। এক নাগাড়ে ক'বছর ওর রান্না খেয়ে আমার রক্ত আমাশা হবার যোগাড় হয়েছে। তা অবিশ্যি বিনোদ যদি না ছাড়ে তাহ'লে যাবেন কিছুদিন পরে হাসপাতালে। সেখানে গিয়েই না হয় আমাকে দেখবেন।

না না, সে কি কথা—

যা হবে তাই বলছি, মা—

কিন্তু বিনোদ—তারাকিংকরী বললেন।

বিনোদকে কে পরোয়া করে মা ? আমি ? ও বলুক না ওর অমত আছে !

না না আমার অমত থাকবে কেন ? বিনোদ বলল।

অবিশ্যি কিশোরীর যদি কোনও অসুবিধে হয় বা সুবলের—দাড়িদা বললেন।

না না, আমাদের অসুবিধে হবে না। কিশোরী বলল।

কাল দুপুরে গাড়ি নিয়ে আসব, মা। দিনকতক বেড়িয়ে আসুন ছেলের বাড়ি থেকে।

তা বেশ বাবা! তারাকিংকরী বললেন। কিন্তু তোমরা উঠো না।

আপনি রান্নাঘরে যাচ্ছেন তো? দাড়িদা জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ।

তাহ'লে তো চেপে বসলাম। পেট পুরে না খেয়ে উঠছি না।

তারাকিংকরী রান্নাঘরে চলে গেলেন। কিশোরীও যাবার জন্যে এগোল।

আজ গান শুনতে ইচ্ছে করছে দাড়িদা, বিনোদ বলল।

যে গান গাইতে পারে সে তো চলে যাচ্ছে, দাড়িদা জবাব দিলেন।

তাকে থাকতে বলো না, বলো না গাইতে।

আমি বললে সে শুনবে কেন?

আমি বললে শুনবে না, তুমি বললে শুনবে না, তো কে বললে শুনবে? ওদিকে এই হারমোনিয়মটা ফাঁকা পড়ে থাকবে তো! আমি তো সারে গামাও শিখি নি।

শুনছ তো কিশোরী? দাড়িদা বললেন। আর চুপচাপ

থাকলে কৃষ্ণের জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতায় গিয়ে দাঁড়াবে। একটা কিছু গেয়ে শোনাও।

কি গাইব বলুন? কিশোরী বলল।

দাড়িদা চেয়ে দেখলেন কিশোরীর দিকে! কি ভাবছে এই মেয়েটি তা ঠিক্ ধরতে পারলেন না। তবে এটুকু বুঝলেন বিনোদকে আঘাত করতে এ মেয়েটি চায় না। বিনোদের প্রতি তার মনে বিদ্রূপ বা বিদ্বেষের ভাব নেই। অথচ বিনোদ সহজভাবে এর সঙ্গে মিশতে পারছে না। ঠিক্ কি হয়েছে বুঝতে পারলেন না দাড়িদা। অন্ধকারেই একটা ঢিল ছুঁড়লেন।

বলেলন, দেখ, আমার অতিথি যখন হচ্ছ কাল থেকে, তখন তোমার গান তো আমি যখন তখন শুনব। সব শ্যামা-সংগীত আর রামপ্রসাদী। কারণ আমার দাড়ি রয়েছে দেখছ তো! আজকের সন্ধ্যায় না হয় ছেলে ছোক্‌রাদের উপযোগী কিছু একটা গাও।

কিশোরী ধীরে ধীরে গিয়ে হার্‌মোনিয়মে বস্‌ল। বিনোদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল কিশোরীর প্রতিটি পদক্ষেপ। কিন্তু বিনোদ কিশোরীকে কোন কথাই বলতে পারল না। স্তব্ধ হয়ে শুনল কিশোরী গাইছে—

তোমায় ফেলে চলি যখন যাবার নেশায়,
হৃদয় আমার ডেকে বলে; যাবি কোথায়?

যে মহাসাগরের টানে
প্রাণের নদী বইছে গানে,
সেই সাগরের শেষ হয়েছে
তোরই হিয়ায় তোরই হিয়ায়।

যাবি যেথায় সেথায় যে তার ছোঁয়া লেগে
নতুন করে তারই সে রূপ উঠবে জেগে!
মনের মাথা তুই খেয়েছিস্
তারই সুরে গান বেঁধেছিস্,
চোখ বুঁজে চোখ মরবে নাকো
তারই সে রূপ দেখবি জেগে॥

দাড়িদা স্তব্ধ হয়ে শুনলেন কিশোরীর গান। বিনোদের জন্যে আজ সন্ধ্যায় কিশোরী এই গান গাইল কেন? গাইল যদি, তো এতটা আন্তরিকতা কেন ফুটে বেরোল তার গলার স্বরে? তার কণ্ঠের প্রকাশভঙ্গীর অনাবিল মাধুর্যে যে সত্য রূপ নিয়েছে, তার যথার্থ আবেদন কি স্পর্শ করেছে গণ্ডারের চামড়ার মতো কঠিন বিনোদের এত দিনের পোড়-খাওয়া মনে?

গানের রেশ ভালো করে মিলিয়ে যাবার আগেই কিশোরী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, মা ডাকছেন বোধ হয়। চা নিয়ে আসি। তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনোদের দিকে চেয়ে দাড়িদা বললেন, প্রায় মেরে এনেছ!

কেন লজ্জা দিচ্ছ দাড়িদা ? বিনোদ বলল। আমি কি চিরকালই একটা পাষণ্ড হয়ে থাকব ? কোনও দিন কি ভালো হতে পারি না ?

বালাই ! ষাট্ ! ভালো হতে পারবে না কেন ? তবে কি জানো ? ভূতের মুখে রাম নাম। তাই ভয় করে !

এবার দেখো। ভয়ের কিছু নেই। বিনোদ জোর গলায় বলল।

বেশ ! বেশ ! দাড়িদা জবাব দিলেন।

৫০

কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে মনোমোহিনী হক্চকিয়ে গেলেন। মধুর হঠাৎ এত উন্নতি হ'ল কি করে ? ঘরদোর এমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর বিনোদের ঘর দুটোর চেহারাই বা এমন ভদ্র ও সুরুচিসম্পন্ন হ'ল কেন ? বিনোদের আস্তানা হয়েছে তার আপিসঘরে। রান্নাঘরে ঢুকে মনোমোহিনী দেবীর আর কোনও সন্দেহ রইল না। মধু সাত জন্মেও রান্নাঘর এমন গুছিয়ে রাখতে পারবে না। কাশীতে গিয়ে ঐ মেয়েটি, সুরমা না কি যেন নাম, যে বলে এসেছিল বিনোদ তার বাড়িতে কে একটি মেয়ে, তার মা আর তার ভাইকে আশ্রয় দিয়েছে, সেই কথাটা তাহ'লে মিথ্যে নয়।

কিন্তু তারা গেল কোথায় ? বিনোদ নিশ্চয়ই তাদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাঠাবার দরকার কি ছিল ? বিনোদের কি কিছু গোপন করবার আছে তার মামীর কাছ থেকে ? না, মামা-মামীর বিবেচনার ওপর বিনোদের বিশ্বাস নেই ? পাছে মামা বা মামী মেয়েটিকে বা তার মাকে বা ভাইকে কোনও কিছু কড়া কথা বলে ফেলে এই ভয়ে বিনোদ তাদের সরিয়ে দিয়েছে ? যাই হোক্, এ কথা পরিস্কার করে জিজ্ঞাসা করতে মনোমোহিনীর বাধল। কিন্তু কিরীটীভূষণ বাবু প্রথম সুযোগেই কথাটা পাড়লেন।

বললেন, ঘর দোর গুছিয়েছ কি আমার আসার খবর পেয়ে, বিনোদ ?

চা খেতে খেতে বিনোদ বলল, না, তার আগে থেকেই।

আমাদের ব্যবহারের জন্যে ?

কথার মোড়টা কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মনোমোহিনী দেবী ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দিলেন। স্বামীকে তর্জন করে বললেন, কেন ? বিনু যা গুছিয়েছে তা কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না ? না হয়ে থাকে তো আমাকে হুকুম দাও, আমি নতুন করে তোমার ঘর সাজিয়ে দিই। বুড়ো বয়সে শখ কত !

সে-কথা নয়—কিরীটীবাবু বললেন।

ভেতরে আসতে পারি ? বলে সুরমা ভেতরে ঢুকল।

ব'সো মা, ব'সো, মনোমোহিনী দেবী বললেন। বুঝলি বিনোদ, এই মেয়েটির কাছে তোর খবর পেয়ে আমি তো

নিশ্চিন্দি হয়ে বসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কেন যে কালীঘাটে মাকে দেখবার ইচ্ছেটা এমন পেয়ে বসল বুঝতে পারলাম না। তাই হুট্ করে এসে পড়লাম।

এসেছ যখন তখন হুট্ করে যেতে পারবে না, বিনোদ বলল।

চা খাও মা, বলে মনোমোহিনী সুরমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিলেন।

এই যে খাই, সুরমা বলল। তারপর, ওঁদের দেখছি না যে?

বিনোদের চোখে মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

মনোমোহিনী দেবী বললেন, কাদের?

সেই যে কিশোরী, তার মা, তার ভাই—বলুন না বিনোদবাবু।

হ্যাঁ, তাও তো বটে, বিনোদ। মনোমোহিনী দেবী বললেন। এই মেয়েটিরই মুখে শুনেছিলাম যে আমাদের কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা যেন গ্রাম থেকে এসে এ বাড়িতে উঠেছেন। তা তাঁরা এখন কোথায়? দেশে ফিরে গেছেন?

দেশে তো এখন মহামারী ব্যাপার। ফিরবেন কি করে? কিরীটীবাবু বললেন।

তাছাড়া ফিরে গিয়ে করবেনই বা কি? সুরমা বলল। তাঁরা নিশ্চয়ই কলকাতাতেই আছেন।

হ্যাঁ, বিনোদ বলল। তাঁদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন।

একদিন নেমন্তন্ন করে আনিস্, আলাপ করব। এখন উঠি। চলো গো, আরতি দেখিয়ে আনবে।

আবার আমি—কিরীটীবাবু বললেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি! বলি, পরকালের কথাটা কি কোনদিনই ভাববে না? চলো, চলো। চলি মা। আজ আমি নিজে মাংস রাঁধব। যেখানেই যাস্, তাড়াতাড়ি ফিরবি, বুঝলি বিনু?

বিনোদ বলল, আচ্ছা।

স্বামীকে নিয়ে মনোমোহিনী চলে গেলেন। তাঁদের গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ কানে এলো।

বিনোদের দিকে চেয়ে সুরমা বলল, মামীকে কোন্ মন্তরে যাদু করেছ আমাকে বলবে? তোমার বিরুদ্ধে কোনও কথাতেই কান দেন না।

তাকে যাদু করবার আমার তো কোনও দরকার হয় না, সুরমা। মামীমা যে মায়ের মতো আমাকে মানুষ করেছেন।

তুমি বলতে পারো বিনোদ, কেন আমি এত নীচ হয়ে গেলাম? খেঁকী কুকুরের মতো সকলকেই ভেংচে বেড়াচ্ছি? কিশোরী তোমাকে ভালোবাসে কি না জানি না, তবু তাকে নিয়ে তোমার এমন বদনাম রটাচ্ছি। এ আমার হ'ল কি বিনোদ?

দাড়িদা মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রো। বিনোদ বলল।

দাড়িদা শুক্‌নো মানুষ, বিয়ে-থাওয়া করেন নি, কখনও প্রেমে পড়েছেন বলে শুনিনি। তাঁর ঐ ছাপানো মনস্তত্ত্বের

বই ঘেঁটে আমার মনের ব্যথা-বেদনার মীমাংসা তিনি করতে পারবেন না। তুমি জহুরী মানুষ বিনোদ, তুমিই বলো। সুরমা উঠে এসে বিনোদের কাছে দাঁড়াল।

বিনোদ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুরমা বাধা দিয়ে বলল, জবাব দিলে না?

আমার চেয়ে ভালো জহুরী আছে, সুরমা। তার কাছে যাও। গেলে জবাব পাবে। বিনোদ এগোল।

আমাকে অপমান করলে, বিনোদ? সুরমা মুখ তুলে চাইল বিনোদের দিকে।

বিনোদ থম্‌কে দাঁড়াল। বলল, অপমান তোমাকে আমি করিনি, সুরমা। আমি বিজন দত্তের কথাটাই বলেছি। ও আজও তোমাকে ভালোবাসে।

কিন্তু ভার নিতে ভয় পায়। সুরমা ধীরে ধীরে বলল।

সে শক্তি একদিন ওর হবেই—

সুরমা শুনল বিনোদ এই কথাগুলো বলছে। কিন্তু মুখ তুলে চেয়ে দেখল বিনোদ নেই। পাছে সুরমার সঙ্গে যেতে হয় এই ভয়ে বিনোদ যে পালাল, সুরমা সে কথা বুঝল।

ধীরে ধীরে সুরমা গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। ধীরে ধীরে পথ দিয়ে চলতে লাগল। কলকাতার রাস্তার ফুটপাথে তখন মাঝে মাঝে মরণোন্মুখ নিঃস্বদের দেখা যেত। এ-আর-পি-র লোকজন সেই রকম একটি মানুষকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল।' সেই ভিড়টাকে কাটিয়ে সুরমা

এগিয়ে চলল। জোরে পা চালাতে চাইলেও কেমন একটা অবসাদ যেন সুরমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল একটা গানের একটা লাইন, 'পায়ে হেঁটে না যাও যদি মনে মনেই যেয়ো।' সুরমার মনটা কখন তার অজান্তে বিজনের দিকে আকুল হয়ে এগিয়ে গেছে, বিদ্যুতের এক-ঝলকে-দেখা মন্দিরের চূড়োর মতো হঠাৎ-স্পষ্ট এই সত্যটি লজ্জায় ফেলল সুরমাকে। ও তাড়াতাড়ি চলতে লাগল আর শীগগির বাড়ি পৌঁছে গেল।

৫১

'বাড়ি পৌঁছে সুরমা দেখল তাদের ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজার পাশে ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে বিজন দত্ত বসে আছে। তার মুখে মদের গন্ধ, হাতে একটা মরা হাঁস।

সুরমাকে দেখেই বিজন বলল, ভাগ্যটা আমার ভালোই। তুমি তাড়াতাড়ি এসে পড়লে। তোমার মাকে এত করে বললাম এটা রোস্ট করতে, তোমাতে আমাতে খাব, তা আমাকে ঢুকতেই দিলেন না।

বেশ করেছেন তিনি। সুরমা বলল। তা এ হাঁসটা পেলে কোথায়?

শিকারে গিয়েছিলাম বন্ধুর সঙ্গে। ফেরবার সময় এইটা নিয়ে চলে এলাম।'

বড় সাবধানী মাতাল তো তুমি। মদ খেয়ে চাটের ব্যবস্থা হাতে নিয়ে ফিরেছ। কিন্তু এখানে কেন?

হঠাৎ মনে হ'ল, সুরমা, তোমাকে কখনও কিছু দিতে পারি নি। আজ এই—

হাঁসটা শিকার করেছ—

তাই দুজনে মিলেই এটা খাব। তা তোমার মা—

তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেন্ নি। আমার মা পাগল নন্, তাই। কিন্তু দুনিয়াতে কি আর জায়গা ছিল না, যে তুমি এখানে এসেছ—আমার কাছে?

কি করব সুরমা? তোমার কথাই যে আমার বার বার মনে পড়ে। তাই তো এইটা পেয়েই—

লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করতে ছুটে এসেছ?

গজ্ গজ্ করতে করতে সুরমা দরজায় টোকা দিল। সুরমার মা দরজা খুলে দিলেন। সুরমার পাশ দিয়ে হাঁসটা হাতে নিয়ে বিজন দত্ত সুড়ুৎ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তুমি যাওনি এখনও? সুরমার মা বললেন।

আপনি এবারে অবসর নিন্। বিজন জবাব দিল। দরকার হলে আপনার মেয়েই আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। এই হাঁসটার যদি রোস্ট্ করে দেন। বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমার। সুরমাও খাবে।

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখুনি! সুরমার মা অস্বাভাবিক রকম চেঁচিয়ে উঠলেন।

বিজন দত্ত হকচকিয়ে গেল। বলল, মাপ করবেন। আমি এখুনি যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি—

মা! সুরমার স্বরে আর্তনাদ ফুটে উঠল।

না না, আমি কোনও কথা শুনব না, সুরমা। সে দিন রাত্তিরে ও এসেছিল। ওই গান গেয়ে গেল। গ্রামোফোন নয়। আমি জানি। আমি সহ্য করব না। একটা অমানুষের হাতে আমার মেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এ আমি সহ্য করব না। ও চলে যাক্, ও চলে যাক্ এখান থেকে। বলতে বলতে সুরমার মা ভেতরে চলে গেলেন।

বিজন দত্ত হেসে ফেলল। বলল, এইবার আর ভাবনা নেই। আমি পালকগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে এখুনি এটা ড্রেস্ করে দিচ্ছি। তুমি স্টোভ্‌টা জ্বালো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুরমা বলল, তুমি কেন এলে? কেন এলে তুমি এখানে?

বাঃ! বিজন দত্ত বলল। তোমাকে দেখতে যে আমার ভালো লাগে। তোমার মা একটু চটে যান্ মাঝে মাঝে। তা' গেলেনই বা!

না। এরকম করে তুমি আর আসতে পারবে না। আর যদি আসতে চাও তাহ'লে—

তাহ'লে কি? বিজন মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল।

তাহ'লে আমার ভার তুমি নাও, বিজনের দিকে চাইল সুরমা।

বিজন চোখ নামিয়ে নিল। বলল, আমি দাঁড়িয়ে নিই সুরমা, আমি আগে রোজগার করি। তারপর—

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখুনি, সুরমা বলে উঠল। স্ত্রীর ভার বইবার শক্তি নেই, একটানা প্রেম করবার শখ আছে? বেরিয়ে যাও—

বিজন চলে যাচ্ছিল।

আর, আর, সুরমা বলল। আর এইটাকে নিয়ে যাও!

রাগের মাথায় সুরমা ছুঁড়ে দিল হাঁসটাকে।

হাঁসটা এসে পড়ল বিজনের মুখের ওপর।

তারপরই পড়ল মাটিতে।

হাঁসটাকে তুলে নিয়ে বিজন বলল, হে পাখী, শূন্যপথে তুমি আমার মুখে এসে পড়লে। কিন্তু কাঁচা মাংস খাব এত ক্ষিধে তো আমার এখনও পায়নি।

পাখীর নখের আঁচড়ে বিজনের মুখের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত জমে উঠল। কাছে এসে সুরমা বলল, কেটে গেছে?

কোনও দিন কাটবে না সুরমা, বিজন জবাব দিল। তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ কোনও দিনই কাটবে না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আজ আমি বড় অসময়ে এসে পড়েছি। তুমি আজ আর কাউকে আশা করছ।

বেরিয়ে যাও!—সুরমা তর্জন করে উঠল।

তারই আসার লাগি তুমি তোমার গৃহ সুসজ্জিত করো পুষ্পে-পল্লবে, আমি যাই দূরে—

গেট্ আউট্!—সুরমা চেঁচিয়ে উঠল।

এ হংস-শরীর আজি বিশ্ব-হিতে করে যাই দান—হাঁসটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আবৃত্তির সুরে কথাটা বলতে বলতে বিজন এগোল।

দরওয়ান্, সুরমা হাঁকল, নিকাল্ দেও!

দরওয়ান্ লাগবে না, সুরমা। তোমার মাকেও না। বিজন দত্ত হেসে বলল। আমাকে তাড়াবার পক্ষে তুমি একাই যথেষ্ট।

বাটন্-হোলে গোলাপ গো তার, ঘর সাজানো ফুলে,
মধু দিয়ে পূজব গো তায়, তোমায় তাড়াই হুলে।—

গাইতে গাইতে বিজন দত্ত নেমে গেল। সুরমা ফ্ল্যাটের দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ করে দিল।

৫২

দাড়িদার বাড়ির দরজার সামনে এসে বিনোদ থমকে দাঁড়াল। বড় ভিড় সেখানে। অনাথ-আতুরদের ভিড়। সব শালপাতা কলাপাতা পেতে বসে গেছে। মহা উৎসাহে তাদের পরিবেশন করছেন তারাকিংকরী। খবরদারি করছে দাড়িদার বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি সব কিছু, ঐ লোট্রন।

ভিড় ক্রমে বাড়ছে দেখে লোট্রন বলল, মা জী ভেতরে

যাও। এত লোক আসবে যে তাদের খাবার দিতে পারব না। কাড়াকাড়ি করবে, গালমন্দ ভি করবে। তুমি অন্দর যাও।

তারাকিংকরী ভেতরে গেলেন। বিনোদও দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

এসো বাবা, ভেতরে এসো,—তারাকিংকরী বিনোদকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

দাড়িদার বসবার ঘরে বিনোদ বসল। এখানেও টাইপ-রাইটার রয়েছে, তবে তাতে লেখা হচ্ছে এই দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচবার উপায় সম্বন্ধে নানা রকমের গবেষণা, সব দাড়িদার কবি-কল্পনা।

সেবাকার্যে যোগ দিয়েছেন দেখছি? বিনোদ বলল।

তোমাদেরই দয়ায় বাবা, তারাকিংকরী জবাব দিলেন। নইলে যে অন্ন আজ আমার হাত দিয়ে ঈশ্বর অন্নহীনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, সেই অন্নই সপরিবারে হাত পেতে কোথাও থেকে সংগ্রহ করে হয়তো আমাদের বেঁচে থাকতে হ'ত। সবই তোমাদের দয়ায় বাবা।

দেখুন, এরকম কথা যদি বলেন, তাহ'লে আর আমি আপনাদের ত্রিসীমানায় আসব না, বিনোদ বলল। সুবল আপনার ছোট ছেলে। আপনার বড় ছেলে কি থাকতে পারে না?

—পেয়েছি তো বাবা, দুটিকে পেয়েছি। তুমি রয়েছ, সমীর রয়েছে। আমার আর তো কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু

বড় দুঃখ হয় বাবা এদের দেখলে। বাইরে যাদের তুমি দেখে এলে। সহরের পথে পথে আজ যাদের তোমরা দেখছ। এদের দুঃখ যে কি তা তোমরা সহরের লোক, তোমরা তো বুঝবে না, বাবা। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আমি বুঝব। এদের আর আমার মধ্যে তফাৎ যে এতটুকুও নেই এটা যে ঈশ্বর আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বাবা!

—তাই বুঝি নিজের শরীর পাত করে এই রান্নাবাড়া, এই সব খাওয়ানো দাওয়ানো—

—এই কাজে যদি শরীর পাত হয় বাবা তো হিঁদুর ঘরের বিধবার এর চেয়ে আর বড় ভাগ্য কি হ'তে পারে? অন্নহীন ভগবান্ বহু দুঃখীর মূর্তি ধরে এসেছেন আমার সামনে। তাঁরই সেবা করতে করতে দেহ রাখব, এমন ভাগ্য আমার হবে কি? কিন্তু কতটুকু সেবা এদের আমরা করছি? তাই তো সমীর যখন মাঝে মাঝে বলে তখন আমি চুপ করে শুনি। আর ভাবি, যে দেশের যত জ্ঞানী-গুণী-ধনীরা আমার এই পাগল ছেলের কথাগুলো শুধু বেয়াড়া খেয়াল বলেই উড়িয়ে দিল! যদি তারা একটু শুনত এই জাতের লোকের কথাগুলো, তাহ'লে যারা চোখের সামনে দুদিন পরে মরবে তাদের অনেকেই হয়তো মরত না।

আজকাল বুঝি এই সব কথাই দিনরাত হচ্ছে বাড়িতে? বিনোদ বলল।

· তোমার দাড়িদাকে তুমি তো আমার চেয়ে ভালোই জানো

বাবা, তারাকিংকরী বললেন। এ ছাড়া ওর ভাববার যে কিছুই এখন নেই, সে তো তুমিও জানো। ওর যা কিছু ছিল বা আছে সবই তো খরচ করছে এই দরিদ্র-নারায়ণ সেবায়।

—আমরা চাল বেচে পয়সা রোজগার করছি এই দুর্ভিক্ষের বাজারে, আর আমাদের অফিসে এখনও ওঁকে কাজ করতে হচ্ছে। তাই সেই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করছেন বোধ হয় এই সেবা করে ? বিনোদ বলল।

—হয়তো তাই হবে। কিন্তু তোমাকে তো চা দেওয়া হয়নি। তুমি একটু ব'সো। আমি এখুনি করে আনছি।

তারাকিংকরী রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

৫৩

কলকাতার পথে পথে অনাথ আতুরদের ভিড়। কংকাল মা, কংকালতর ছেলের জীবনটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে শুক্নো স্তন নিপীড়ন করেও স্নেহসুধা বের করতে পারছে না এতটুকু। আর সেই বেদনায় নয়, না-পারার সেই দুঃখে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আরও কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। সংসারগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। সমর্থ পুরুষেরা সংসার বাঁচাবার উপায় না পেয়ে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখতে অপারগ হয়ে ছিটকে পড়েছে। তাদের পালানোর মধ্যে স্বার্থপরতাটাই সব সময় বড় কারণ নয়।

পথে সংসার পাতবার এই যে এদের ক্ষীণ প্রয়াস, ভিক্ষামুষ্টি অবলম্বন করে বেঁচে থাকবার এই যে এদের করুণ

আকুতি, এর মধ্যে হয়তো প্রকাশ পাচ্ছে এদের অসীম দুর্বলতা, আর না হয় ফুটে উঠছে বহু যুগের অর্জিত সভ্যতার সংস্কার, যা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে পরস্বাপহরণকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি বাঁচিয়ে রেখেছে। চোখের সামনে খাবার দেখেও না খেতে পেয়ে যারা মরল, লুটপাট করল না, কাটাকাটি করল না, তারা ক্লীবের মতো মরল, না মহাপুরুষের মতো মরল, এ গবেষণা একদিন হয়তো কেউ করবে,—কিন্তু চোখের সামনে মৃত্যুর এই নির্মম অভিযান দেখেও চারপাশে মানুষ কি করে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে, এইটাই বুঝতে পারছিল না দেশের কতকগুলো লোক।

দাড়িদা তাদেরই মধ্যে একজন। পথের পাশে যারা মরণের অপেক্ষা করছে তাদের তুচ্ছতম সাহায্য করবার চেষ্টায় বেরিয়ে কিশোরীকে এই কথাগুলো বলছিলেন দাড়িদা। বলছিলেন, অনেকে ভাবছেন এই কথাগুলো। কাগজে লেখালেখিও হচ্ছে খুব। কিন্তু এই ডাকে সাড়া কি দেবে কেউ? কেউ-ই কি সাড়া দেবে না? প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য মানুষের প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ত্যাগ করবার সময় স্তব্ধ নিঃশ্বাসে মহাশূন্যের বুকে যে অতি ক্ষীণ স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে, তার সম্মিলিত শক্তি যে পৃথিবীকে বিরাট বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যাবে, যদি না এখনও মানুষ মানুষের মুখের দিকে চাইতে শেখে, একথা, নিজেদের মানুষ বলে যারা গর্ব করে, তারা কি কিছুতেই বুঝবে না?

৫৪

বিজন দত্ত চলে গেল। কিন্তু তার সেই চলে যাওয়াতে সুরমার মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কেন? তার মা তো ভুল করেন নি। বলেছিলেন, একজন অমানুষের হাতে আমার মেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এ আমি সইতে পারব না। বিজন দত্ত অমানুষ। অমানুষ ছাড়া সে আর কি! সুরমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে ঠিকই আসে। কিন্তু ঘর বাঁধবার দায়িত্ব যখনই তার ঘাড়ে চাপতে চায় তখনই পাশ কাটায়, পালায়। শীকার করা হাঁসটা এনেছিল সুরমার সঙ্গে খাবে বলে। এসব শুকনো প্রেমের লীলাতে সুরমার দরকার? আর এর ওপর বিনোদ বারবার বলে, বিজন দত্ত তোমাকে ভালোবাসে সুরমা, সত্যিই তোমাকে ভালোবাসে।

এই দায়িত্ববোধহীন ভালোবাসা নিয়ে সুরমা করবে কি? কি করবে সে, তা বিনোদ কি তাকে বলে দেবে? হ্যাঁ, সে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দিয়েছে সে বিজন দত্তকে। তার মা বিজনকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেও তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ করেছে সে। হাঁস। ছুঁড়ে সুরমা মেরেছিল বিজনকে। ছুঁড়ে সে মারেনি, সে রাগের মাথায় অমনি ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেটা গিয়ে লেগেছিল বিজনের মুখে। কিন্তু বিজন দত্ত কি তা বিশ্বাস করবে? না করুক্। বেশ করেছে সুরমা তাকে হাঁস ছুড়ে মেরেছে। অপর কারুর আশায় সুরমা বসেছিল

এই তো বিজন দত্তের ধারণা ? বেশ করেছে সে বিজন দত্তকে হাঁস ছুঁড়ে মেরেছে।

কিন্তু কেন বিজন ভাববে, যে বিনোদের আশায় সুরমা বসে থাকে, আর কেন বিনোদ বলবে বিজন দত্ত সুরমাকে ভালোবাসে, আর কেন এই ভাবা আর বলার ফাঁকে দুজনেই পাশ কাটিয়ে যাবে, আর একা অসহায় জীবন কাটাবে সুরমা ? এর মীমাংসা একটা করা চাই-ই, সুরমা ভাবল।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সুরমা বেরিয়ে পড়ল। মুখটা মেরামত করবার জন্যেও আয়নার সামনে থামল না। সোজা বেরিয়ে গেল। তার যাওয়ার পথের পেছনে দরজাটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আওয়াজ পেয়ে সুরমার মা বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তখন মেয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। পেছু ডেকে লাভ নেই।

৫৫

কিশোরীর কথা ভেবে আর কি করব বাবা, তারাকিংকরী বলছিলেন। সহজ সামাজিক জীবন তো আমাদের আর বেঁচে রইল না। পাত্তর ঠিক করে মেয়ের বিয়ে দোব, এমন আশা নেই। কারণ, কলঙ্ক সত্যি না হলেও একবার রটলে বিয়েতে ভাংচি পড়বেই। আর আমার দেওর আর দেওর-বৌ কিশোরীর ক্ষতি করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

তাহ'লে আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ—বিনোদ কি ভেবে কথাটা শেষ করল না।

সমীরের সঙ্গে সে-কথাও বলেছি, বাবা। ও তো সংসারে থেকেও বিবাগী। বলল, একটি বোন আমার চাই, তা সে সন্ন্যাসিনী হলেও চলবে। মেয়েরও দেখছি সেই ইচ্ছে। বলছে, চাকরি-বাকরি করবে, সেবা-সমিতি গড়বে, ভাইকে লেখাপড়া শেখাবে, তার বিয়ে-থা দেবে, আর এই ভাবেই জীবনটা কাটাবে। আমি কি বলব বাবা; জোর করে মেয়ের বিয়ে দিতে তো পারি না? বিশেষ, অকারণ সন্দেহে আমার মেয়েকে যে অপমান করতে পারে এমন লোকের সঙ্গে তো নয়ই।

—কিন্তু এমন কি কেউ নেই যে বিশ্বাস করবে আপনার মেয়ের কোনও ত্রুটি, কোনও অপরাধই হয়নি—না সমাজের দিক থেকে, না ভগবানের বিচারে?

—তুমি তো সবই জানো বাবা। আমাদের সমাজকেও তুমি চেনো। তোমাদের অফিসে আমার মেয়ের চাকরি করা, তোমার বাড়িতে আমাদের থাকা, তার ওপর সুরমা বলে ঐ মেয়েটির কথাবার্তা, এই সব দেখেশুনে আমার মেয়েকে অপমান করবার জন্য মনে মনে তৈরি হবে না, এমন বিয়ের উপযুক্ত ছেলে তুমি কি খুঁজে পাবে একটিও?

—কিন্তু এসব কথা জানে না এমন কোনও—

—এমন কোনও পাত্রের হাতে আমার মেয়ে পড়বে না।

তাকে আমি জানি। সত্য গোপন করে মিথ্যে ছাড়পত্র নিয়ে কারুর সংসারে সে ঢুকবে না। বাপের কাছ থেকে সে অন্য-রকম শিক্ষা পেয়েছে।

—কিন্তু আপনার মেয়েকে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা করে তাকে বিয়ে করবে, এই রকম একটি ছেলেও কি আপনার নজরে পড়েনি ?

তারাকিংকরী চুপ করে রইলেন।

একটু থেমে বিনোদ বলল, আমি ভালো ছেলে নই। কিন্তু আমি কি কিছুতেই আপনার সন্তান হবার উপযুক্ত হতে পারি না ?

—বাবা, একি সত্যি ! আমার পোড়া কপালে এও কি সম্ভব ?

—আমার মামীমা এসেছেন। এ সব ঝক্কি তাঁর। তাঁর ঘাড়েই ফেলে দোব। তিনিই কথা বলবেন আপনার সঙ্গে। আমি উঠি।

—আর একটু বসবে না বাবা ?

—না। মামীমা রান্না করে বসে আছেন আমার জন্যে। আজ উঠি।

বিনোদ চলে গেল। তারাকিংকরী তাকে আর আটকালেন না। যা বলে গেল তা বিনোদের মতো ছেলেকেও একটু লজ্জায় ফেলেছে। পাগলাটে ছেলে, তাই নিজের বিয়ের কথা নিজেই বলে ফেলল। কিন্তু কিশোরী ? কিশোরী কি চোখে দেখেছে

বিনোদকে, কে জানে ? অনাহার থেকে রক্ষা করেছে বলেই বিনোদের মতো ফুর্তিবাজ আর বহু-মেয়ের-সঙ্গে-মেশা ছেলেকে কিশোরী কি বিয়ে করবে ? হয়তো বেঁকে বসবে। হয়তো চাকরিই করবে সারাজীবন। সংসার কি, হয়তো তা জানতেই চাইবে না কোনও দিন।

না পেলে এর মর্ম মেয়েমানুষ বোঝে না। পেলেও কি বোঝে সব সময় ? তিনি কি বুঝেছিলেন ? স্বর্গগত স্বামীর কথা তারাকিংকরীর মনে পড়ল। আজ তাঁর যে চোখ ফুটেছে, এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি আগে তাঁর থাকত তাহ'লে তিনি তাঁর স্বামীকে ঢের বেশি সুখী করতে পারতেন। ঈশ্বর চরম দুঃখ তাঁকে দিলেন, চরম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে চরম শিক্ষাও দিলেন তাঁকে—কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল! কিশোরীর বাবার জীবনে পূর্ণতার স্বাদ তারাকিংকরী দিতে পারলেন না। আজ কিশোরীও কি ভুল বুঝে বা ভয় পেয়ে নিজেকে বঞ্চিত করবে, আর নষ্ট করবে বিনোদের জীবন ? কোনও কিছু অনুমান করতে তারাকিংকরী পারলেন না। ঘুরে ঘুরে তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়ল। কাপড়ের খুঁটে তিনি চোখ মুছলেন।

৫৬

হঠাৎ নিজেকে প্রকাশ করে ফেলার লজ্জাটুকু নিজের মনের কাছ থেকে লুকোতে জোরে জোরে পা ফেলে চলছে বিনোদ, এমন সময় থমকে থেমে গেল। শুনল, একটি মেয়ে ডাকছে, বিনোদ!

দাঁড়িয়ে দেখল সামনে সুরমা।

তুমি এখানে? এ সময়ে?

মধুর লোভে ভ্রমর তুমি, এখানে আসবে আমি জানতাম। কিন্তু রাণী মৌমাছি কি চাকে নেই? বিহার করতে গেছেন বাহনটির সঙ্গে?

কি বলছ স্পষ্ট করে বলো।

বলছি, কিশোরী আর দাড়িদা কে উ-ই কি বাড়িতে নেই?

না।

দুজনে একসঙ্গেই বেরিয়েছেন?

হ্যাঁ। কেন?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

জবাব তো পেয়েছ। আর কিছু বলবে?

না, বলব না। বলব না যে দাড়িদা প্রেমে পড়েছেন কিশোরীর এবং কিশোরী দাড়িদার। কারণ, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, আর কথাটাও মিথ্যে হবে। কিন্তু আমার এসব কথায় তুমি বেশি চটছ না কেন? তুমি কি টের পেয়েছ যে

তুমি যেমন কিশোরীকে ভালোবাসো তেমনি কিশোরীও ভালোবাসে তোমাকে ?

আমি কি টের পাই না পাই, তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও কেন ?

আর একজন যে অনেক মাথা ঘামিয়ে এসে বলে গেল যে আমি আশা করছি তাকে নয়, অন্য কাউকে, মানে তোমাকে।

কে সে ?

কে আবার ? বিজন। বিজন দত্ত।

এসেছিল ? তোমার কাছে ?

হ্যাঁ। এনেছিল একটা মরা হাঁস। শীকার করেছিল সেটা। এনেছিল, সে আর আমি দুজনে খাব বলে। তা আমার মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমিও তাড়িয়ে দিয়েছি। জানো বিনোদ, আমি হাঁসটাকে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম বিজনের মুখে। বিজনের মুখটা খানিকটা কেটে গেল। না, ঠিক কাটেনি। রক্ত জমে উঠল।

সে কি !

হ্যাঁ। আমি বললাম, বেরিয়ে যাও, গেট্ আউট্ !

কেন ?

ঐ এক কথা। ভার বইবার ভরসা নেই, প্রেম করবার প্যানপ্যানানি আছে। আচ্ছা বিনোদ, ওর কি ধারণা আমি চাল ডাল আটা ময়দার বদলে সোনা রুপো খাই, আর হাতীর দাঁতের পালঙ্ক না পেলে ঘুমোই না ? বলতে পারো বিনোদ, ও এমন কেন ?

কিন্তু তুমি এখানে এলে কেন?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

কেন?

বিজনকে তাড়িয়ে দিলাম, এখন বিনোদ না হলে আমার মনের কথার জবাব দেবে কে? তোমরা দুজনে, একজন ভালোবেসে, আর একজন ভালো না বেসে কতদিন আমাকে এমন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে?

বেশি দিন নয়। তুমি বাড়ি যাও সুরমা।

আমাকে পৌঁছে দেবে?

তা না হয় দোব। কিন্তু দাড়িদার নামে তুমি ওসব যা তা বলছিলে কেন?

—মিছে কথা যদি বলতেই হয় তাহ'লে দাড়িদার সম্বন্ধেই বলা ভালো। কারণ, কেউ বিশ্বাস করবে না। আচ্ছা, বিজনের কি খুব বেশি লেগেছে বলে তোমার মনে হয়? সুরমার স্বরটা হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ভরসা দিয়ে বিনোদ বলল, না না। মুখে একটা ঘুসি লাগলে এমন আর কি লাগে! কত ঘুসি খেয়ে কত ঘুসি মেরে বিজন দত্ত বেঁচে আছে, আর ঐ একটা ঘুসি—তাও তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েছিলে, আর ওর গায়ে লেগে গেছে। আরে ছিঃ, ও কথা ভেবো না। চলো, এগোনো যাক্।

দুজনে এগোল।

৫৭

বিনোদ যা ভেবেছিল তা ভুল নয়। মনোমোহিনী সত্যিই খাবার নিয়ে বসেছিলেন তার জন্যে। কিরীটীভূষণবাবু তখন শয্যা নিয়েছেন। বিনোদ এতে খুশিই হয়েছিল। মামার সামনে পড়াটা এই সময়ে তার পছন্দ নয়। বেয়াড়া প্রশ্ন এক আধটা করে ফেলতে পারেন। মামীমা যে করবেন না, তা নয়। কিন্তু তবুও তাঁকে সামলে নেওয়া যাবে।

মামীমা বিনোদকে খেতে দিয়ে বললেন, হ্যাঁরে, সেই যে মেয়েটি, তার মা আর ভাই, যাদের আশ্রয় দিয়েছিলি, তাদের খবরটবর নিস্ মাঝে মাঝে ?

কৈ আর নেওয়া হয় ? বিনোদ বলল।

মধু বলছিল, মেয়েটি বড় ভালো। যদি আমাদের স্বঘর হয়—

যদি স্বঘর হয় তাহ'লে কি করবে ?

তুই তো আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে এলি এতদিন। আরও একবার না হয় আমাকে দাঁত খিঁচোবি। মেয়েটিকে যদি আমার ভালো লাগে, তাহ'লে আমি তোকে সংসারী হতে বলব।

আমার চেয়ে ঘোরতর সংসারী কি আর আছে নাকি ? বিনোদ বলল। কি রকম, লোকের গলায় পা দিয়ে টাকা রোজগার করছি, দেখছ তো ! এর ওপর আবার বিয়ে করলে ? টাকার জন্যে লোককে সত্য সত্য খুন করব।

মামার ব্যবসা দেখছিস্, এর মধ্যে খুন-জখম কোথায় পেলি ? তোর ওসব এড়ানো কথা আর বাজে ওজর আমি শুনব না, বিনু। যদি আমার মেয়েটিকে পছন্দ হয় আর যদি ঘরবর মেলে, তাহ'লে কানটি ধরে বিয়ের পিঁড়িতে তোকে আমি বসাবই।

আমাকে পেলে তো ; বলে বিনোদ খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

সে যা হয় আমি বুঝব'খন। তা আমাকে একদিন মেয়েটির কাছে নিয়ে চ। মনোমোহিনী দেবী বললেন।

তুমি যাবে কোন দুঃখে ? তুমি আমার মামী ; তার বাড়িতে যাবে কেন ? সে আসবে।

কি জানি বাপু ? আগে থেকে হাতে রাখা ভালো। ভাগ্নে-বউ হয়ে যদি মামী-শাশুড়ীকে বিদেয় করে দেয় ?

মামী, তুমি এখুনি মধুটাকে বিদেয় করো। নইলে বাজে কথা বলে বলে ও তোমার মাথা খারাপ করে দেবে।

সে হবে এখন। তা তুই মেয়েটিকে কবে আমায় দেখাচ্ছিস্ বল্।

দু' একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করছি।

বিনোদ নিজের ঘরে চলে গেল। মধু ঢুকল। বলল, মা, ভগবান যদি চার হাত এক করে দেন, তাহলে বুঝবে সবাই— এই মধু,এই মধুর এলেমটা। আমাকে কিন্তু জরির টুপি কিনে দিতে হবে একটা। দাদাবাবুর বিয়ের দিন সেইটে পরে আমি নাচব।

থাম্ বাপু। ঘরে বরে মেলে তবে তো? টেবিলটা সাফ করে নে দিকি।

মনোমোহিনী দেবী চলে যাচ্ছিলেন। ফিরে এলেন। বললেন, মধু, তুই ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিস্। আমি জানি, ওকে ছাড়া তুই আর কিছু জানিস্ না। তুই একটু ভগবানকে ডাক। তাঁকে বল, আমার বিনু এবার বিয়ে-থা করুক্, সংসারী হোক্।

শোনো কথা! আরে, আমি ভগবানকে না ডাকলে কি অমনি অমনি তিনি মুখ তুলে চাইছেন? তোমার ঐ বাবা বিশ্বনাথের মাথায় ফুল-বেলপাতা চাপিয়ে কি তুমি কিছু করতে পারতে মা-ঠাকরুণ? আমড়াগাছিতে গিয়ে বটেশ্বরতলায় মানত করেছি, তবে দাদাবাবুর মতিগতি ফিরেছে। সব এই মধুর কাজ, বুঝলে? তুমি তো জীবনভোর শুধু বলেই এলে আমি ছেলের দেখাশুনো করতে পারি না। হু '

মনোমোহিনী দেবী হাসলেন, বললেন, রাত হয়ে গেছে। আর দেরি করিস্‌নি বাবা। টেবিলটা সাফ্ করে ফেল। বিনোদ আবার ভোর হতে না হতেই চা খাবে।

৫৮

দুপুরবেলায় অফিসের কাজ নিয়ে শ্রীসমীর চৌধুরী মস্‌গুল হয়ে আছেন, ঝড়ের মতো বিনোদ ঘরে ঢুকে বলল, দাড়িদা, বাঁচাও।

দাড়ির ফাঁকে দাড়িদা একটু মুচকি হাসলেন। আগে কাজটা সহজ ছিল ভায়া। কিন্তু এখন ঘোরতর শক্ত হয়ে গেছে। কিশোরীকে আমার গবেষণার কাজে নিয়ে ভারি ভুল করেছি। তুমি যে-ভাবে চালের কালো বাজারের একজন মাথা হয়ে উঠেছ তাতে কিশোরীকে এখন রাজি করানো—

পাশের টেবিলে বসে কিশোরী কাজ করছিল। কোনও কথা না বলে ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

বিনোদ রুখে উঠে বলল, সে কথা নয়। কাউকে রাজি করাবার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না একথা তোমাকে কে বলল?

কেউ বলেনি। তোমার ভাবগতিক দেখে আমি আন্দাজ করছিলাম।

তোমাকে দয়া করে আর আন্দাজ করতে হবে না। এখন সুরমার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

ও ব্যাপারটার সমাধান আমি অনেক আগেই ভেবে রেখেছি। সুরমার সঙ্গে বিজন দত্তের বিয়ে দিতে পারলেই মিটে যাবে। কিন্তু তা করতে গেলে বিজন দত্তকে একটা ভদ্র মাইনের চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে।

তুমি এত লোকের চাকরি জুটিয়ে দিলে, আর বেচারি বিজনের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারো না ?

চাকরি তো দিয়েছি শুধু একটি মহিলাকে। তাও তোমার বিশেষ অনুরোধে।

এই পুরুষটিকে চাকরি দিতে কি আমি তোমাকে বারণ করছি ? বিনোদ বলল।

তা করো নি বটে। কিন্তু চাকরি কৈ ?

কেন ? তোমার গুদামের রক্ষক তো একজন চাই ! গো-ডাউন্-ইন্-চার্জ একজন তো তোমাকে নিতেই হবে। বিনোদ বলল।

বিজন দত্তকে দিয়ে কি সে কাজ হবে ? দাড়িদা বললেন। ও খেয়ালী লোক। গানটান গায়, মদটদ খায়। চাবিটাই হয়তো ফেলবে হারিয়ে, নয়তো—

না না, সে সব কিছু হবে না। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

তুমি যখন ভরসা দিচ্ছ তখন ভয় কি ? দাড়িদা বললেন। কিন্তু ভালোমন্দ কিছু হলে আমাকে যেন দোষ দিয়ো না।

না না, সে জন্যে ভেবো না। আমি চললুম।

বিনোদ উঠল।

আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির শরীরটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বিনোদ,—দাড়িদা বললেন।

বিনোদ থমকে দাঁড়াল।

তাছাড়া রাত্তিরে ওর ঘুম হচ্ছে না একটুও। একটা কোন ওষুধ-পত্তর বাৎলাতে পারো ভাই ?

দাড়িদার মুখের দিকে চেয়ে বিনোদ গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি বিধান রায় নই, বলেই গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে উঠে কিশোরী বলল, আপনি কি বলুন তো ?

বোসো বোসো, দাড়িদা বললেন। আমি বিনোদের দাড়িদা আর তোমার, তোমার বড়দা। বোসো।

৫৯

সুরমা সেজেগুজে বেরোচ্ছিল। দাড়িদা ঢুকলেন তার ফ্ল্যাটে।

আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম দাড়িদা, সুরমা বলল।

কেন বলো তো ?

কাল বিনোদের কাছে অকারণে আপনার অনেক নিন্দে করেছি। তাই আজ মাপ চাইতে যাচ্ছিলাম।

মাপ এখানেই করলাম, দাড়িদা বললেন।

কিন্তু আপনি যে বড় এখানে দাড়িদা, আমার বাড়িতে ? সুরমা বলল।

কৈ, তুমি কোনও দিন আমাকে তোমার বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছ, এমন তো মনে পড়ে না। অবশ্য নেমন্তন্নও করোনি কোনও দিন। দাড়িদা হেসে বললেন।

নেমন্তন্ন না করলে বুঝি আসতে নেই ? সুরমা জবাব দিল।

দরকার পড়লে আছে। দাড়িদা মুখ তুলে চাইলেন সুরমার দিকে। আর আজ আমার বিশেষ দরকার হয়েছে তোমায়। তাই এসেছি। দাড়িদা বললেন।

আপনার দরকার আমাকে ? সুরমা প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ! আমার সঙ্গে তোমায় এক জায়গায় যেতে হবে। অবিশ্যি, অন্য কোনও মেয়ে গেলেও চলত—দাড়িদা বলেলেন।

তাহলে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে না নিয়ে—সুরমা বলে উঠল।

সুরমার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে দাড়িদা বললেন, এই যাওয়াতে হয়তো বিপদ হতে পারে। তোমাকে ঠাট্টাই করি আর যা-ই করি, আর তুমি আমার নিন্দেই করো, আর যা-ই করো, আমি জানি তোমার ওপর আমার যতটা দাবি আর কারুর ওপর ততটা নেই। কাজটাতে বিপদ হতে পারে বলেই তোমাকে ডাকতে এসেছি। না হলে অপর কাউকে নিয়েই চলে যেতাম।

চলুন, সুরমা এগোল।

তোমার মাকে বলে আসবে না ? দাড়িদা বললেন।

ব্যাপারটাতে বিপদ আছে বললেন, কাজেই মাকে বলে দরকার নেই। চলুন।

সুরমা ও দাড়িদা এগোল।

৬০

যে গলির মধ্যে দাড়িদা ঢুকলেন সুরমাকে নিয়ে সে গলি সুরমার অজানা নয়। সেন্টের খোস্‌বাই উড়িয়ে সে গলি দিয়ে সুরমা যখন যেত তখন সেখানকার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে থাকত ওর দিকে। আজ দাড়িদা সঙ্গে ছিলেন, তবু সুরমা মানুষের দৃষ্টি ঠিকই আকর্ষণ করছিল। সমীরবাবুর দাড়ির চেয়ে সুরমার মুখখানা যে দেখবার বস্তু হিসেবে ভালো, একথা লোকে তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল দেখে, সুরমার ভালোই লাগল।

একটি পুরোণো বাড়ির একখানি একতলা ঘরের সামনে এসে কানে এলো চেনা স্বরে গান চলছে। দাড়িদা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। একটি লোক দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে গ্লাসে মদ ঢেলে খাচ্ছিল আর গাইছিল,

কোন্ পাতালে ফেল বোতল
মেলে না তার তল,
ভুলের ভেলায় ভেসে বলি
দিন হ'ল অচল!

বিজন! দাড়িদা ডাকলেন।

বিজন দত্ত ঘুরে দেখল। দাড়িয়ে উঠে বলল, তোমার মতন মহাপুরুষ এখানে কেন দাড়িদা? আমি যা দিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করতে পারি তা তো তোমার কাছে অচল!

পথে যেতে যেতে তোমার গান শুনলাম, তাই ঢুকে পড়েছি। কিছু অন্যায় হয়েছে কি? দাড়িদা জিজ্ঞাসা করলেন।

না, অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু বসবে কোথায়? আচ্ছা, এই ভাঙা চেয়ারটায় বোসো। বিজন বলল।

সুরমা দাড়িদার পাশে দাঁড়িয়ে।

আমার সঙ্গে যে একজন রয়েছে এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না? দাড়িদা বললেন।

কি করব বলো? আমার তো আর চেয়ার নেই। হয় দুজনে ওটাতে ভাগাভাগি করে বোসো। আর না হয় একজন চেয়ারে আর একজন এই ভাঙা তক্তপোষে বোসো।

দাড়িদা তক্তপোষে বসে সুরমাকে চেয়ারে বসতে ইসারা করলেন। সুরমা বসল।

এই মেয়েটিকে চেনো না বুঝি? দাড়িদা বললেন।

বিজন গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে গেয়ে উঠল,

চেনা অচেনার পারে

খুঁজি তারে বারে বারে,

আঘাতে তাহারে চিনি,

নহে গো বাহুর ডোরে।

গালের ওপরটা এখনও ফুলে রয়েছে, না দাড়িদা? বিজন প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ।

অথচ দেখ, ঘুঁসোঘুঁসি করিনি। বিজন হেসে উঠল।

সুরমা উঠে দাঁড়াল। বলল, চললাম দাড়িদা।

একটু বোসো। দাড়িদা বললেন।

ঘরটা একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেললে কি রকম হয়? বিজনকে প্রশ্ন করলেন দাড়িদা।

লাভ কি? বিজন বলল। গেয়ে উঠল,

ঘরে থেকে পরবাসী।
মায়া-পিঞ্জরে বন্ধ রাখিবে বলে
দেহ দিল ভগবান্‌,
মনের তরণী বেয়ে
দিকে দিকে ঘুরে আসি।
একেরে বাসিয়া ভালো
কাঁদিয়া জনম গেল।
এক যদি করে দূর
বহুতে মিলায়ে সুর
মন্দে জড়ায়ে ভালো
নিজেরে কেবলি নাশি!

থাক্‌, থাক্‌, দাড়িদা বলে উঠলেন। আর ঐ অখাদ্য কুখাদ্যগুলো খেয়ে নিজেরে কেবলি নাশিতে হবে না। তোমার এক তোমারই আছে। তাকে আমি সঙ্গে করেই এনেছি। আর নিজের দাম বাড়াতে যেয়ো না। বহুর বাজারে তুমি

অচল, আমি ভালো রকম জানি। কি যে সুরমা দেখেছে তোমার মধ্যে তা সুরমাই জানে। অন্য কোনও মেয়ে তোমার দিকে ফিরে চাইবে বলে আমার মনে হয় না। এখন তোমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই বাঁচি।

বিয়ে? আমাদের? বিজন্ বলে উঠল।

হ্যাঁ। তোমার আর সুরমার। আর শোনো, আমার একটু উপকার করবে? দাড়িদা বললেন।

আমি? উপকার করব? বিজন দত্ত অবাক হয়ে বলল।

হ্যাঁ। একজন বিশ্বাসী লোকের আমার বড় দরকার। আমাদের গো-ডাউনের ইন্-চার্জ্ হতে হবে। মালপত্রের সব ঝক্কি পোয়াতে হবে। মাইনে বর্তমানে বেশি দিতে পারব না। শ আড়াই মতন পাবে।

শ আড়াই মাইনে পাব? তাহ'লে তো সুরমাকে বিয়ে করতে পারি।

করো না। কে আপত্তি করছে? দাড়িদা বললেন।

কিন্তু চাকরি টিঁকবে তো? বিজন প্রশ্ন করল।

চুরি না করলে টিঁকবে। দাড়িদা বললেন।

মদ খেলে যাবে না?

সে-কথা সুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আমি উঠি। কাল সকালে দশটা আন্দাজ ওকে অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো, সুরমা।

আমিও তো যাব আপনার সঙ্গে—সুরমা বলল।

না। এই বিপদ তোমাকে সামলাতে হবে বলেই তো

তোমাকে ধরে আনলাম। কাল ওকে অফিসে হাজির করা তোমার দায়। আমি চলি।

দাড়িদা এগোলেন।

মিঃ চৌধুরী, বিজন দত্ত বলল, আপনি এবং আপনার দাড়ি দুটো মিলে আপনাকে ইকোয়াল্ টু একেবারে স্যাণ্টা ক্লস্ করে ফেলেছে। অথবা দাড়িওলা ঋষিদের মতন। এলেন, বর দিলেন, চলে গেলেন। আমি পেলাম অর্ধেক। রাজত্ব আর রাজকন্যা। আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি আর সুরমা।

রাজকন্যার যেন কোনও অযত্ন না হয়। তাহলে অর্ধেক কেন, সিকি রাজত্বও তোমার হাতে থাকবে না।

দাড়িদা চলে গেলেন।

সুরমা, ডার্লিং, বিজন দত্ত বলে উঠল। কেন নিজেকে এত ছোট করতে গেলে? আমার মতন একজন অপদার্থ মাতালের চাকরির জন্যে তুমি লোককে অনুরোধ করতে যাও?

তোমার চাকরির জন্যে কাউকে অনুরোধ আমি করিনি। তোমার কাছে দাড়িদা আসবেন একথা না-জানিয়েই আমাকে এখানে এনেছেন।

তাহ'লে এখানে এসেই ফিরে গেলে না কেন?

দেখেছ তো? যাবার চেষ্টা আমি করেছি।

যেতে পারো নি?

না।

কেন?

তার ঠিক জবাব তোমাকে দিতে পারব না। তবে এটুকু আমার মনে হয়েছিল, যে তুমি চিরদিন মাতাল আর অপদার্থ ছিলে না, আর চিরদিন হয়তো থাকবে না।

রাজকন্যা যদি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে না যান্ তাহ'লে সত্যিই হয়তো নতুন করে বাঁচব, সুরমা। আজ এই প্রথম বুঝলাম, সমস্ত হৃদয় দিয়ে আজ এই প্রথম অনুভব করলাম যে আমার সব অন্যায়কে ক্ষমা করে তোমার মনে আমার জন্যে এতটুকু স্থানও তুমি রেখেছ। তাই আমি আজ সুখী সুরমা।

চিরকালের দেওয়া ফাঁকি
পড়ল রে আজ ধরা
কাছে যখন এলে এবার
চেয়ো না আর ছাড়া।

গানের লাইন দুটো গাইতে গাইতে বিজন সুরমার দিকে এগোল। সুরমা দেখছিল বিজনের গালের ওপরটা এখনও ফুলে আছে। দু একদিনের মধ্যে সেরে যাবে বোধ হয়।

৬১

কিশোরী কতদূরে চলে গেছে বিনোদ দিতে আগে বোঝেনি। এখন বুঝলেও কিশোরীকে দূরে যেতে বিনোদের ইচ্ছে একটুও নেই।

তোমার মা কি তোমাকে কিছুই বলেন নি? বিনোদ জিজ্ঞাসা করল।

ভেঙে না বললেও যা বলেছেন তাতে আমি বুঝতে পারি, যে আমার ভবিষ্যৎ যাতে সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্যে আপনি আমাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবেন। দাড়িদার একটা লেখা কিশোরী টাইপ করছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে বলল।

আর আমি এগিয়ে আসছি বলেই কি তুমি পেছিয়ে যাচ্ছ? বিনোদ প্রশ্ন করল।

আপনার ওপর যথেষ্ট জুলুম তো করেছি। আর কেন? কিশোরী টাইপরাইটার বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

তাই যে জুলুম আমি তোমার ওপর করতে পারিনি সেই জুলুম তুমি আমার ওপর করছ। তুমি ঠিক জানো তুমি যদি আজ আমাকে ফিরিয়ে না দাও তো আমি হয়তো মানুষের মতো বাঁচতে পারব। কিন্তু তা জেনেও তুমি আমাকে দূর করে দিচ্ছ। আমার ভবিষ্যৎ কি হবে তা না ভেবেই।

তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, দাড়িদা ঢুকতে ঢুকতে বললেন। আমার আড়ালে যে ভাবে আমার বোনের সঙ্গে মিশছ, তাতে হয় তার সর্বনাশ করবে, আর না হয় তাকে বিয়ে করবে—কি বলো?

বিয়ে করতে পারছি কৈ দাড়িদা? বিনোদ বলল।

তাই তার সর্বনাশ করবে? দাড়িদা জবাব দিলেন।

তাই বা পারছি কৈ? বিনোদ হেসে ফেলল।

তবে তো মুস্কিল। দাড়িদা হেসে উঠলেন। তার পরই জোর গলায় বললেন, ওরে লোট্টন, চা নিয়ে আয়।

আমি যাচ্ছি বড়দা, কিশোরী বলল।

না না, বোসো বোসো। চা লোট্টন নিয়ে আসবে এখন। তুমি বোসো। তোমাকে এখানে এনে তো আমি বড়ই বিপদে পড়লাম কিশোরী। এই সমস্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা আমার বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবেন—

দেখ দাড়িদা, বাজে কথা ব'লো না। বিনোদ বলল। মামীমা কিশোরীকে দেখতে চেয়েছেন, তাই ওকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ও তাই নাকি ? আর কিছু বলোনি কিশোরীকে ? দাড়িদা বিনোদের দিকে চাইলেন।

বিনোদ হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

কি কিশোরী ? কিছু বলে নি ? দাড়িদা বললেন।

কিশোরী হেসে চোখ নামিয়ে নিল।

তাই বলো, দাড়িদা বললেন। একেবারে যাকে বলে প্রোপোজ, মানে বিয়েতে মত চাওয়া, তাও হয়ে গেছে। তা ফল কি হ'ল ?

হ্যাঁ-ও না, না-ও না। বিনোদ বলল।

তা যে হবে তা তো বলেছিলাম অনেক আগেই। চালের কালো বাজারে তুমি একজন মাথা হতে চলেছ। কিশোরী কি করে তোমাকে বিয়ে করবে বলো ? দাড়িদা বললেন।

কোন প্রাণে যে লোকে এরকম অবস্থায় মানুষের অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—কিশোরী বলল।

কিশোরীকে কথাটা শেষ করতে দিল না বিনোদ। বলল, বুঝেছি দাড়িদা। এতদিন পরে জয় তোমারই। হোম্ থেকে টাইট্। অর্থাৎ কিনা, অন্দর হইতে বাধ্যকরণ। কিন্তু, আমাকে তো সিধে করলে। এখন আমার মামার মত বদলাবে কি করে? সেখানেও কি মামীমাকে দিয়ে?

নয়তো কি? দাড়িদা বললেন। সহধর্মিণীরা যদি স্বামীদের ধর্মের পথে না নিয়ে যান্ তাহলে তাঁরা করলেন কি? মাভৈঃ। চলো, চা খেয়ে কিশোরীকে নিয়ে তোমাদের ওখানে যাই।

চলো, বিনোদ বলল। কিন্তু দাড়িদা, ও ব্যাপারটার কি করলে?

ভয় নেই, দাড়িদা বললেন। মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে গেছে সেখানে। এবার তোমাদের পালা। চলো।

সকলে এগোল।

৬২

কিশোরীকে মনোমোহিনীর বড় ভালো লাগল। মধুর যখন ভালো লেগেছে তখন মনোমোহিনী দেবীর ভালো লাগবেই, এরকম একটা ধারণা মধুর ছিল। মনোমোহিনী খোঁজখবর

নিয়ে ঘর বরের সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হলেন। কিশোরীকে কাজের অছিলায় রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে এসে সমীরকে বললেন, মেয়ের মা আপত্তি করবে না তো সমীর?

সমীর ওরফে দাড়িদা চমকে উঠলেন। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর দেরি হল না। বললেন, না, না, মেয়ের মা আপত্তি করবেন না। বিনোদের সঙ্গে কিশোরীর বিয়ে হলে তিনি খুব খুশিই হবেন।

আর বিনোদ নিজে?

ওর কথা বলবেন না। ওর এখন কেমন অবস্থা জানেন? না—নেপো খাবি, না হাত ধোব কোথায়?

যাক্, মনোমোহিনী দেবী বললেন। ভগবান তাহ'লে এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

কৈ। তা তো মনে হচ্ছে না। দাড়িদা বলে উঠলেন।

কেন?

কিশোরী কি বিয়ে করবে বিনোদকে? দাড়িদা চিন্তিত স্বরে বললেন।

কেন? বিনোদকে কি কিশোরীর অপছন্দ?

বিনোদকে নয়। বিনোদের কাজকে। দাড়িদা জবাব দিলেন।

ছেলে বয়সে ভুলচুক্ কে না করে? তা বলে লক্ষ্মী হয়ে যে ঘরে আসছে সে সেটা মাপ করতে পারবে না?

আহা! ভুল করছেন যে! বিনোদের পাগলামিতে কে

ভয় খায় ? সেজন্যে নয়। কিশোরীর আপত্তি হচ্ছে বিনোদের ব্যবসাতে।

কেন ? বিনোদের ব্যবসাটা কি খারাপ ? তুমিও তো রয়েছ সে ব্যবসার মধ্যে। তার মামার কারবার।

কারবারটা মামার হলেও আজকের দিনে অনেক লোককে মারছে যে। অনেক গরীব লোককে। খেতে না দিয়ে মারছে।

কি রকম ?

আপনাদের অফিসে তো আমিও চাকরি করি। যে পাপ আপনারা করছেন তার খানিকটা তো আমার গায়েও লাগবে। ছ টাকা মন চাল কিনেছেন। ষাট টাকায় সে চাল বিক্রি করছেন। আর খেতে না পেয়ে দুধারে এত লোক মরছে।

আমরা আর চাল ধরে রেখেছি কোথায় ? নিজেদের খরচের মতন কিছু—

মাপ করবেন। আপনার অন্নপূর্ণার সংসার, মানি। কিন্তু বছরে লাখ তিনেক মন চাল নিশ্চয়ই আপনার খরচ হয় না ?

বুঝেছি বাবা। আমি বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢাললে কি হবে ? কর্তার কাজকর্মের ভারে বাসুকি নড়ে বসছেন যে। তা এই যদি অসুবিধে হয় তো কিশোরীকে বোলো বিনোদকে বিয়ে করতে সে যেন আপত্তি না করে। চালের ব্যবসা আর আমরা করব না।

তাহ'লে মামাবাবুর সঙ্গে একটা আলোচনা—

কে করবে ? তুমি ?

হ্যাঁ। আমার থীসিস্, ফ্যাক্টস্ অ্যাণ্ড ফিগার্স্, মানে তথ্য এবং সংখ্যা সবই সংগ্রহ করা আছে। এক ঘণ্টা বসলেই—

প্রমাণ করে দেবে যে কর্তা যেটা করছেন সেটা ঠিক্ নয় ? বুঝেছি। তুমি বাড়ি গিয়ে দেওয়ালকে বুঝিয়ো। বেশি কাজ হবে।

তাহ'লে কিশোরীর মত—

হ্যাঁ। ও যেন মত করে। এ ভাবে চালের ব্যবসা বিনোদ আর করবে না।

মধু, মধু, বলতে বলতে কিরীটীভূষণ বাবু ঢুকলেন।

কি গো ? মনোমোহিনী দেবী বললেন, কি হয়েছে ?

কল্‌কেটা একটু পাল্‌টে দেবে, তা—কিরীটীবাবু বললেন।

তুমি কি গো ? রামায়ণ পড়তে পড়তে কল্‌কের জন্যে উঠে এলে ?

কল্‌কে কি ফেলবার জিনিস ? কিরীটীবাবু রসিকতাই করে ফেললেন। কল্‌কে পেতে হবে বলেই তো উঠে এলাম—কি বলো সমীর ?

সমীর হেসে ফেলল।

মনোমোহিনী দেবী বললেন, ঢের হয়েছে। তুমি যাও। গিয়ে পড়ো গে। আমি এখুনি আসছি। আবার নতুন করে

তামাক সেজে দোবো। সংস্কৃতটা ভালো বুঝিনা। তাই তোমাকে খাটাই। নইলে—

আহা। আমার তো তাতে আপত্তি নেই। পরকালের কাজটাও হয়, সময়টাও কাটে। কিন্তু তামাক নইলে যে—

তামাকের জন্যে ভাবনা কি? আমি যাচ্ছি। আর শোনো। বিনোদের বিয়ে ঠিক করছি যে।

সে কি? কোথায়?

আমাদেরই পাল্‌টি ঘর। মেয়েটি বড় ভালো।

আরে, তুমি তো বলছ ভালো। বিনোদের কি পছন্দ হয়েছে?

হয়নি আবার? নইলে কি এমনি পাকা করতে যাচ্ছি।

বটে। তাহ'লে তো একটা কাজ করলে। একেবারে অসাধ্য-সাধন!

তুমি তো বিশ্বাস করো না যে আমি কিছু করতে পারি।

পারো না আবার। নাকে দড়ি দিয়ে আমাকে ঘোরাচ্ছ এত বছর ধরে—

কি সব যা তা বলো যখন তখন। আর শোন, মেয়েটি কিন্তু বড় গরীব। দিতে থুতে পারবে না।

সে কি রকম? বিনোদের বউ—

বিনোদ মেয়েটিকে বিয়ে করবে। টাকাকড়িকে নয়। মেয়েটিকে তার সত্যিই পছন্দ হয়েছে। আর টাকাকড়ির তার অভাব কি?

তা বেশ। তোমার যখন মত—

শোনো, আমি এই সমীরকে পাঠাচ্ছি—

কোথায় ?

মেয়ের কুটুম্বদের আনতে। মেয়ের মা এখানেই আছে। মেয়ের খুড়ো-খুড়িমা এদের সব আনতে।

তা বেশ, বেশ। কিন্তু তামাকটা—

তুমি এগোও। আমি যাচ্ছি।

কিরীটীবাবু চলে গেলেন ভেতর দিকে।

তাঁর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে সমীরবাবু ওরফে দাড়িদা বললেন, বিশ্বাস করবেন না হয়তো। এই লোকটির ভয়ে অফিস শুদ্ধু লোক তটস্থ। আর বাংলাদেশের শতকরা পাঁচটা লোকও অন্ততঃ দুবেলা ওঁকে গাল দিচ্ছে।

সেটা আমাদের দূরদৃষ্ট বাবা, মনোমোহিনী দেবী বললেন। তা দেখি, কি করতে পারি। তুমি কিন্তু কালই যেয়ো কিশোরীর খুড়োমশায়ের বাড়ি। তাঁদের কলকাতায় আসতে নেমন্তন্ন করে এসো। প্রথম বিয়ের তারিখেই আমি বিনোদ-কিশোরীর বিয়ে দোব।

কিন্তু কিশোরীর আপত্তির কথা—

মনে আছে। সে ব্যবস্থার ভার আমি নিচ্ছি। তুমি কিশোরীর আত্মীয়দের খবর দাও।

কাল সকালের দিকে আমি ব্যস্ত আছি। বিকেলের দিকে যাব।

বেশ।

কিন্তু বিনোদ কোথায়? দাড়িদা বলে উঠলেন। তাকে দেখছি না যে?

বুড়ো গোপালের মতো নাচতে নাচতে মধু ঘরে ঢুকল। বলল, গ্যাখসে মা, দাদাবাবুর কাণ্ড। রান্নাঘরে গিয়ে আলু-চচ্চড়ি করছে। কটা লঙ্কা দেবে তাই নিয়ে দিদিমণির সঙ্গে কি ঝগড়া!

তুই দেখ গে যা মধু, আমার ওসব ভালো লাগে না।

তা লাগবে কেন? ছেলেটাকে তুমি কবেই বা ভালো চোখে দেখলে? মধু ফোঁস্ করে উঠল।

ছেলেকে নিয়ে মাথা ঘামালে তো আমার চলবে না। ছেলের মামাকে এখুনি তামাক সেজে দিতে হবে।

তাই বলো। তুমি ঠাট্টা করছিলে। মধু জোর নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল।

হ্যাঁরে হ্যাঁ, আহাম্মুক—বলে মুখ টিপে হাসতে হাসতে মনোমোহিনী ভেতরে চলে গেলেন।

মধু আবার নাচতে নাচতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

ওদিকে বুড়োবুড়ীর কড়া পাক, আর এদিকে ছোঁড়াছুঁড়ির পলকে প্রণয়, এই দুটো নদী দুপাশ দিয়ে বয়ে গেল। মাঝখানে উমানন্দ ভৈরবের মতো বালির চড়া নিয়ে জেগে রইলেন সদাড়ি দাড়িদা।

হতাশ হয়ে ডাকলেন, মধু, এক কাপ চা খাওয়াবি বাবা, এক কাপ চা!

৬৩

পরদিন ঠিক দশটার সময় বিজনকে নিয়ে সুরমা হাজির হ'ল দাড়িদার অফিসে। দাড়িদা তৈরিই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগপত্র দিয়ে দিলেন। একমাসের মাইনে অগ্রিম দিলেন।

ট্যারা হয়ে গেলুম দাড়িদা—বিজন বলল। আমাকে এমন কাজের লোক আপনি কবে থেকে ঠাওরালেন ?

বিশ্বাসী লোক চাই ভাই। আর তা পেতে গেলে তার দাম দিতে হয়। কৃপণ হলে চলে না। তোমাকে যা দিচ্ছি তা তোমার পাওনা বলেই দিচ্ছি। আমাদের পাঁচ নম্বর গো-ডাউনের সমস্ত ভার তোমার ওপর। অফিস থেকেই এঁরা তোমাকে নিয়ে গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দেবেন। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে।

আপনার সেক্রেটারি কৈ দাড়িদা ? সুরমা বলল।

ছুটি নিয়েছে ভাই। তুমি করবে নাকি কাজ তার বদলে ? দাড়িদা বললেন।

না না, বিজন জবাব দিল। সুরমা কাজ করবে কেন ? আর বিশেষ আমি যখন চাকরি পেয়েছি।

তাহ'লে হ'ল না সুরমা। মালিকের অনুমতি নেই। আমি চলি।

দাড়িদা বেরিয়ে গেলেন।

বেশ তো ! বিজন বলল। এ যেন একেবারে আরবা

উপন্যাসের মতো ঘটছে। মাতাল বিজন দত্ত মিত্র বোস এণ্ড কোম্পানির গো-ডাউন ইন্-চার্জ। বিতাড়িত বিজন দত্ত আজ সুন্দরী সুরমার সঙ্গলাভে ধন্য। আমায় একটা চিম্‌টি কাটবে সুরমা? দেখব, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি।

ভাঁড়ামির একটা সীমা থাকা উচিত। ভুলে যেওনা এটা অফিস—সুরমা চাপা গলায় তর্জন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এটা যে আফিস সেটা প্রমাণ করবার জন্যে মিত্র বোস এণ্ড কোম্পানির একজন কর্মচারি ঘরে ঢুকলেন, বললেন, মাপ করবেন, মিস্টার দত্ত। গাড়ি এসে গেছে। পাঁচ নম্বর গো-ডাউনের জন্যে কি আমরা এখুনি বেরুব?

নিশ্চয়, বলে বিজন দত্ত উঠে দাঁড়াল।

৬৪

মন্দাকিনী মানুষটা মন্দ নন, হরেনবাবুর এ ধারণা বরাবরই আছে। তবু যে কেন লোকে তাকে ভালো চোখে দেখতে পারে না, এটাই তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। অবিশ্যি মাঝে মাঝে পারেন। গভীর রাতে দাম্পত্য কলহের ফলে যখন শয়নগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে দাওয়ায় বা বসবার ঘরে তাঁকে রাত কাটাতে হয়, তখন তিনি মনে মনে মা কালীর খাঁড়ার সঙ্গে মন্দাকিনীর জিভের তুলনা করেন। কিন্তু সেই

ক্ষুরধার জিভ যে আজ সোজাসুজি না কেটে বিষধর সাপের মতন কামড়াবে, এটাই তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি।

কলকাতা থেকে একজন দাড়িওলা ভদ্রলোক এসেছেন। কি ব্যাপার? না কিশোরীর বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছে। পাত্র একজন বিশিষ্ট ঘরের ছেলে। অর্থবান্। মামার যাবতীয় সম্পত্তি সমস্ত পাবে। অবিশ্যি এই বিয়েটা কিশোরীর সঙ্গে না হয়ে যদি হরেনের মেয়ে নেড়ীর সঙ্গে হ'ত, তাহ'লে হরেন খুশি হতেন একটু বেশি। কিন্তু নেড়ী যে নেহাৎ-ই বাচ্ছা। তা যাই হোক্, দাদার ক্ষুদকুঁড়ো তো, হরেন ভাবলেন। হাজার হোক্ কিশোরীর একটা গতি হল।

কিন্তু মন্দাকিনী কি সেটুকু বুঝলেন? একেবারেই না। হরেন যখন দাড়িওলা ভদ্রলোককে চা খাওয়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, তখন মন্দাকিনী হরেনকে উপলক্ষ্য করেই অনেকগুলো বেফাঁস কথা বলে ফেললেন। তাই কি? না, না। সম্বন্ধটা যাতে ভেঙে যায় সেজন্যে কিশোরীর বদনাম দিলেন।

ঘরের মধ্যে একটু এদিক ওদিক ঘুরে মন্দাকিনী বলে উঠলেন, ওমা? একি কাল-কেউটে মেয়ে গো? যা বলে তাই করে! বলে গেল, বাজারে যদি বেরুতে হয় তাহ'লে বাজার গরম করেই বেরুব। সত্যি তাই করল। ওগো, জিগ্যেস করো না বাবুটিকে, দেবদূত গর্ভে নিয়েই কি আমাদের কিশোরী বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি? বাসরঘর থেকে বেরিয়েই কি আঁতুড়'ঘরে ঢুকবে?

ছিঃ ছিঃ, হরেনবাবু দুর্বলভাবে বলে উঠলেন। ছিঃ ছিঃ। দাড়িদার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তাঁকে খাতির না করার সাহস হরেনবাবুর ছিল না। বলে উঠলেন, কিছু মনে করবেন না, স্যার! আমার ওয়াইফ্ একেবারে অজ, মানে পাড়াগেঁয়ে। কিশোরীকে দেখতেই পারে না। অবিশ্যি আমার ক্ষমতা কিছুই নেই! তবু একেবারে ভাসিয়েও দিতে হ'ত না ওদের, যদি না ঘরে এই রণচণ্ডী থাকতেন। কি করব স্যার, আমি নিরুপায়। নইলে কিশোরী, সুবল—দাদার ক্ষুদ-কুঁড়ো ওরা। সাধে কি চুপ করে আছি? তা আমি যাব নিশ্চয়ই—সম্প্রদানও করব। কিন্তু বোঝেন তো? না আছে গাড়িভাড়া, না আছে পোষাক-পরিচ্ছদ।

সেজন্যে ভাবনা কি? বিনোদের মামীমা স্বয়ং কলকাতায় বসে রয়েছেন। আপনাদের কলকাতায় যাবার খরচার জন্যে পাঁচশ' টাকা পাঠালেন। আপনার দাদার যে তাঁরা বড় ভক্ত। তাঁর গানের তারিফ্ সকলেই করেন। তাই তো এই কুটুম্বিতে করবার জন্যে এত ঝুঁকেছেন।

দিন স্যার, দিন। তবে পাঁচশ টাকায়—

না কুলোয়, কলকাতায় পৌঁছে আর যা দরকার চেয়ে নেবেন।

বিলক্ষণ! নোব না? আপনাদের সঙ্গে, হাজার হোক, কুটুম্বিতে একটা হবে তো? চেয়ে নোব না? তা স্যার, যদি দয়া করে একটু বসেন। এক পেয়ালা চা আপনাকে না খাওয়ালে—

আর একদিন খাওয়াবেন! দাড়িদা বললেন। কুটুম্বিতে তো হ'ল আপনাদের সঙ্গে। আর একদিন হবে'খন। বিনোদ যে সম্পর্কে আমার ভাই হয়।

ও! তাহ'লে তো আর কথাই নেই। চা তাহ'লে আর একদিনই খাবেন। আজ তাহ'লে—

নমস্কার, বলে দাড়িদা উঠে দাঁড়ালেন।

নমস্কার, বলেই হরেন নোটগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে পলক পড়ল না। কখন যে দাড়িওলা ভদ্রলোক বেরিয়ে গেছেন এবং মন্দাকিনী তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা তিনি টের পান নি। টের পেলেন যখন চিলের মতন ছোঁ মেরে টাকাগুলো মন্দাকিনী কেড়ে নিলেন।

যাবে নাকি কলকাতায়? মন্দাকিনী রুখে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

গেলে হয়তো আর পাঁচশ পাওয়া যেত—আকাশ পানে চোখ তুলে হরেনবাবু বললেন।

আহা! আমি কি যেতে বারণ করছি না কি? মন্দাকিনী বললেন। তা তুমি একটু গান-বাজনার চর্চা করো না কেন আবার? ছেলেবেলায় তো ভালোই গাইতে।

কেন বলো তো? হরেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

যদি নেড়ীর আমাদের কোনও গতি হয়। মন্দাকিনী বললেন।

দুটো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হরেন বললেন, নেড়ীর গতি? ঘণ্টা হবে ঘণ্টা! কি চেহারা! কেমন মায়ের মেয়ে!

দেখ—বলে মন্দাকিনী দম নিতে নিতেই একরকম মুক্তকচ্ছ হয়েই হরেনবাবু পাড়া বেড়াতে বেরুলেন। যদিও মন্দাকিনী লোক মন্দ নন, তবু এ রকম মুহূর্তে তাঁর সামনে থাকাটা হরেনবাবুর পক্ষেও সমীচীন নয়।

৬৫

মনোমোহিনী দেবীকে সুসংবাদটা দেবার জন্যে মনের আনন্দে দাড়িদা বিনোদের বাড়িতে ঢুকেই মুষড়ে গেলেন। দেখলেন, অদ্ভুত ব্যাপার। বসবার ঘরে কিরীটীভূষণ বাবু গম্ভীরভাবে বসে আছেন। মনোমোহিনী দেবী আর একদিকে বসে। তাঁর মুখ গম্ভীর। একটু আগে অশ্রুবর্ষণ করেছেন বলে বোধ হচ্ছে। বিনোদ গম্ভীর মুখে বসে। কিশোরী থেকে থেকে আড়চোখে চাইছে বিনোদের দিকে, আর মনোমোহিনী দেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিরীটীবাবু কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ খুলছেন, কিন্তু কিছু না বলেই তামাক টানছেন। দাড়িদা আস্তে আস্তে গিয়ে বসলেন। কয়েকবার দাড়িদাকে দেখে কিছু বলতে গিয়েও যেন কিরীটীবাবু থেমে গেলেন। তারপর একটান জোর তামাক খেয়ে গলাটা সাফ্ করে নিয়ে বললেন, এই যে সমীর, তুমি এসেছ। তুমি বলো তো। এই যে আমরা এতটা চাল ধরে রেখেছি, লাভ

অবিশ্যি পাব ভালোই। কিন্তু এদিকে যে এত লোক না খেয়ে মরছে, তা এ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য?

আজ্ঞে অবিশ্যি—দাড়িদা বললেন, পয়সা দিয়ে কেনা—

হয়েছে, হয়েছে, কিরীটীবাবু থামিয়ে দিলেন দাড়িদাকে। তুমিও তো আমার ভাগ্‌নের মতো হে! অর্থপিশাচ। দুটো পয়সা মুনাফা পেলেই হল! লোকে না খেয়ে মরছে, দেখবার দরকার নেই?

আজ্ঞে—

আজ্ঞে কি? আমি কারুর কথা শুনব না। সব বাহাদুরি নিতে এসেছে। আমার ব্যবসায় লাভ দেখিয়ে দেবে! আর এদিকে—

আজ্ঞে, এদিকে কি?

এদিকে কি? শুনলে তো ঠাট্টা করবে? তোমরা সব আজকালকার ছেলে—ঠাকুর দেবতা মানো না—

কি করে মানব? বিনোদ বলে উঠল। শোনো দাড়িদা, মামিমা স্বপ্ন দেখেছেন, যেন মা কালী দর্শন দিয়ে তাঁকে বলছেন, পোকা মাকড়ের মতো লোককে না খেতে দিয়ে মারছিস্, আর তোর কি হবে ঐ দেখ্। তারপর যেন মামিমা দেখলেন, মামাবাবুর হাত-পা বাঁধা, সমস্ত শরীরে মধু লাগানো রয়েছে, আর কোটি কোটি কাঠপিঁপড়ে মামাবাবুকে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। মামিমা তাড়াতে যাবেন কি? তাঁরও হাত পা বাঁধা। তিনি শুধু দেখছেন। নড়তেও পারছেন না।

কিরীটীভূষণ বাবু শিউরে উঠলেন। মনোমোহিনী দেবী আঁচলে চোখ মুছলেন।

এসব গাঁজা নয়, দাড়িদা? বিনোদ বলে উঠল।

থাম, থাম, কিরীটীবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন, মামা চোখ বুঁজলে তুমিই তো মালিক হবে হে। তখন না হয় দেশের লোকের রক্ত নির্যাস করে তুমি পয়সা কোরো। যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন এসব হবে না। শোনো সমীর, চাল আর বিক্রি হবে না। সব ভিখিরিদের খাওয়াও। মনোমোহিনী সেবাসংঘ নাম দিয়ে অনাথ-আতুরদের সেবার একটা ব্যবস্থা করে ফেল।

আজ্ঞে—

আজ্ঞে—আজ্ঞে কি?

আজ্ঞে, আপনি যা বলবেন তাই করব।

হ্যাঁ। তাই করো। কিরীটীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

দাড়িদা, দাড়িদা, আপনি এখানে? বলতে বলতে সুরমা ঘরে এসে ঢুকল। তার বেশভূষা বিপর্যস্ত। যেন দৌড়তে দৌড়তে এসেছে বলে মনে হ'ল।

কি ব্যাপার সুরমা?

তুমি এখুনি চলো দাড়িদা—পাঁচ নম্বর গো-ডাউনে চলো—

কেন?

সেখানে বোধ হয় এতক্ষণে মারপিট হচ্ছে। বিজনকে তারা নিশ্চয়ই পুলিশে দিয়েছে।

সে কি ?

হ্যাঁ। এখুনি চলো দাড়িদা। বিনোদ, তুমিও চলো। এখুনি।

বিজন সত্যিই বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি। আরে, এক সের ভুসের চালের জন্যে লাইন লাগাতে হয়, সে দেখেছে, আর এখানে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার মন চাল—এই কটা টিনের শেডের মধ্যে। আর যক্ষের মতো তাকে তা আগলে থাকতে হবে—আর চারপাশে লোক না খেয়ে মরছে, মরবে আর ও দেখবে ? কেন ? না, মাস গেলে আড়াই শ টাকা—আর সুরমাকে বিয়ে করা। দুত্তোর ! বিজন দিনের বেলায় দিশি মদ খানিকটা খেল। পাশের কর্মচারিটি নাকে রুমাল দিলেন।

দাও বাবা, নাকে রুমাল দাও, বিজন দত্ত ভাবল। কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বিজন দত্ত যে কোথায় রুমাল দেবে তা তো বুঝে উঠতে পারছে না। বিজন দত্ত দিনের বেলায় মদ খায়। তোমরা তাকে ঘেন্না করছ। ভালো কথা। কিন্তু তোমরা যে দিনদুপুরে, দিনদুপুরের পর দিনদুপুরে—এমন কত শত দিনদুপুর কেটে যাচ্ছে কে জানে—হাজার হাজার

লোককে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারছ চাট্টি টাকা ব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা হচ্ছে দেখবার জন্যে—তা তোমাদের এই ব্যাপারটা দেখে বিজন দত্ত কোথায় রুমালটা দেবে? নাকে দিলে তো কুলোবে না। বিজন দত্ত আবার মদ খেল। কর্মচারিটি নাক সিঁটকে উঠে গেলেন।

ব্যাপারটা যে কি করে ঘটল বিজন দত্ত নিজেই ঠিক ঠাহর করতে পারেনি হ্যাঁ—ও একবার গুদাম ছেড়ে উঠে গিয়েছিল দেশী মদের দোকানে। এক বোতল কিনে নিয়ে আসছে, দেখল একটা বুড়া একটা কচি মেয়ের সঙ্গে বসে আঁস্তাকুড় থেকে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ও হঠাৎ বলল, বুড়ি, চাল নিবি?

বুড়ী বলল, দাও না বাবা।

আয় আমার সঙ্গে, বলে বিজন দত্ত বোতল থেকেই মদ খেতে খেতে এসে গুদামের দরজা খুলল। তার পর চাট্টি চাল বের করে দিল বুড়ীকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম আরও অনেক বুড়ী, আরও অনেক বুড়ো, আরও অনেক শুকিয়ে-যাওয়া, মরতে-বসা নানান বয়সের মানুষ—প্রেতের মতো মানুষ, বিজন দত্তকে ঘিরে ফেলল। তারা সবাই চাল চায়। তাদের অত চাল বের করে দেবে কে? বিজন দত্ত? পারবে না। তার অত খাটুনি পোষায় না। তাছাড়া তাকে বোতলটা শেষ করতে হবে। বিজন দত্ত বলল, বের করে নিগে যা। আর তার পরই কত,

কত, প্রেতের মতো মানুষ ঢুকতে লাগল সেই গুদামে তা বিজন দত্ত গুনে উঠতে পারল না। ও মদ খাচ্ছে।

দরওয়ান এসে ওকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল বিজন দত্তের মনে পড়ে, কেয়া হো রহা হ্যায় বাবু? বিজন দত্ত জবাব দিয়েছিল, ঠিক হ্যায়। সরাব লাও। বলে বিজন দত্ত তাকে টাকা বের করে দিয়েছিল। দরওয়ান মদও এনে দিয়েছিল।

অবিশ্যি সুরমা খানিকটা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করেছিল। কি করছ বিজন? বলেছিল বারকতক। আরে বিজন কি করছে তা বিজন বলবে কি করে? বিজন কি জানে ও কি করছে? তাহ'লে তো ওকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে হয় ঐ বোতলকে। আর ঐ বোতল কি জবাব দেবে না কি? বোতলের বয়ে গেছে। সে মহাসমুদ্রের মতো গর্জন করে যাবে। আর সেই গর্জনের ভাষাটা হয়তো কেউ বুঝতেই পারবে না। বিজন দত্তই কি বোঝে? হয়তো বোঝে। কিংবা হয়তো পরিষ্কার বোঝে না।

কর্মচারিটি একবার এসে বললেন বটে, এ সব কি হচ্ছে? কার হুকুমে করছেন এ সব?

বিজনের মনে পড়ে, অস্পষ্ট মনে পড়ে, ও বলেছিল, হুকুম? হ্যাঁ, আছে বৈকি।

কার?

চোখ তুলে বিজন বলেছিল, জানেন না?

ফ্যাল্‌ফেলিয়ে কর্মচারিটি বলে উঠলেন, না তো দ...

জেনে আসুন তাহ'লে, বলে বিজন দত্ত আবার মদ খেতে লাগল।

একটা গাড়িতে চড়ে কর্মচারিটি চলে গেলেন। সঙ্গে গেল সুরমা। প্রেতের মতো মানুষেরা গুদাম থেকে চাল বের করে নিয়ে যাচ্ছে। বিজন দত্ত মদ খাচ্ছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে আর একজন কর্মচারি এলো। রুখতে গেল প্রেতের মতো মানুষদের। তারা বাধা মানল না। দেখিয়ে দিল বিজন দত্তকে। আর ঢুকতে গেল গুদামের মধ্যে। আর চাল বের করে আনতে লাগল। কর্মচারিটি, এই নতুন কর্মচারিটি, সরে যেতে বলল বিজন দত্তকে। বিজন দত্তর মনে পড়ে গেল ওকে সরে যেতে বলেছিল। বিজন দত্ত সরে নি। বিজন দত্ত সরে গেলেই ঐ প্রেতের মতো মানুষেরা একেবারে প্রেত হয়ে যাবে। মানুষ হবার চেষ্টাও করতে পারবে না। না খেয়ে মরবে। তুলে নিয়ে খেয়ে বাঁচবার মতো মনের জোর পাবে না ওরা। মাতাল বিজন দত্ত বুঝেছিল। তাই বিজন দত্ত সরেনি। তহবিল তছরুপের জন্যে লোকের জেল হয়। এও এক রকমের তহবিল তছরুপ। না হয় বিজন দত্ত জেলেই যাবে। কিন্তু ঐ প্রেতের মতো লোকগুলো—ওদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো প্রেত হবে না—হয়তো বাঁচবে।

বিজন দত্তকে জোর করে সরিয়ে দেবে? বিজন দত্তর গায়ে হাত তুলছে? বিজন দত্তকে লাঠি মারছে? দরওয়ানরা। কর্মচারির [illegible] মারুক। বিজন দত্ত নড়বে না।

প্রেতের মতো লোকগুলো গুদাম থেকে চাল নিয়ে যাচ্ছে। বিজন দত্ত মাতাল। বিজন দত্ত দেখছে। বিজন দত্ত মার খাবে। বিজন দত্ত নড়বে না।

কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। কার কপাল? বিজন দত্ত'র? কিন্তু লাগল না কেন? ঐ অতগুলো প্রেতের, ঐ অতগুলো মানুষ-প্রেতের ক্ষুধার জ্বালা কি বিজন দত্তর আঘাত উপলব্ধি করবার শক্তি লোপ করে দিয়েছিল? কি করে বুঝবে বিজন দত্ত? সে যে মাতাল।

একটা গাড়ি আসছে, না? হ্যাঁ। গাড়িই তো। মোটর গাড়ি। অনেকে নামছে। বিনোদ, দাড়িদা, সুরমা, আর একটি মেয়ে, আর একটি মহিলা—সুরমার মার বয়সী, কিন্তু সুরমার মা নয়, আর একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। একি! এই মধ্য-বয়সী ভদ্রলোককে দেখে সবাই যে সেলাম করছে! ওঃ—ইনিই বুঝি বিনোদের মামা—এই গুদামের মালিক। এবার ইনি নিজের হাতেই বোধ হয় এক ঘা লাঠি কসাবেন বিজন দত্তর মাথায়? তা অন্যায় কি? বিজন দত্ত'র জন্যে লোকসান তো ওঁর অনেক হ'ল। অবিশ্যি লোকসান হ'ল না! অনেক-গুলো প্রেত ঐ চাল নিয়ে মানুষ হয়ে গেল। কিন্তু একথা মাতাল বিজন দত্ত বোঝে। উনি কি করে বুঝবেন? উনি তো মাতাল নন্।

ঐ দলটি এগিয়ে আসছে বিজন দত্ত'র দিকে। মাতাল বিজন দত্ত মার খেয়েছে। এবার শেষ আস্তে মতো দেখে বোতল

দিয়ে মাল খেল। বিজন দত্তকে তো কেউ মারছে না? মানুষ প্রেতগুলো সব আসছে, চাল নিচ্ছে, বেরুচ্ছে। বিজন দত্তকে কেউ মারছে না। কি ব্যাপার? সবাই কি মাতাল হয়ে গেল না কি? দলটি এগিয়ে এসেছে। একেবারে বিজন দত্তর সামনা সামনি। সেই ভদ্রমহিলাটি, যিনি সুরমার মার বয়সী অথচ সুরমার মা নন্, বললেন, তোমরা ভুল করেছ। ইনি হুকুমমত কাজই করেছিলেন। আমি হুকুম দিয়েছিলাম।

. এই ভদ্রমহিলাটি বিনোদের মাসিমা বোধ হয়। মাতাল বিজন দত্ত ঠিক ঠাহর করতে পারল না। বাংলাদেশের মা কি আজও বেঁচে আছেন চারিদিকের এত মানুষ প্রেতের মাঝখানে? মদের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে মাতাল বিজন দত্ত প্রণাম করল বাংলাদেশের মাকে। চোখের সামনের ধূলোটা রক্তে কালো হয়ে উঠল। কে একটি মেয়ে কেঁদে উঠল। মাতাল বিজন দত্ত'র মাথাটা কে যেন কোলে তুলে নিল। কে সে? সুরমা কি?

৬৭

মনোমোহিনী সেবাসংঘের নামটা কিন্তু মনোমোহিনী সেবাসংঘ রইল না। রক্ত-রাখী নামটাই মাতাল বিজন দত্ত'র পছন্দ [illegible] ব্যাখ্যাও করলেন অপূর্ব। দুঃখের মধ্যে দিয়ে

ধনী নির্ধনের মিলন—রক্তের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের পরিচয়—এই সব ভারি ভারি তত্ত্ব শোনালেন। অতএব রক্ত-রাখী নামটাই কায়েম হ'ল।

মনোমোহিনী, তারাকিংকরী, লোট্টন, মধু এক সঙ্গে রান্না বাড়ার কাজে লেগে গেলেন। সুরমার মাও যোগ দিলেন। বিনোদ বিজন পরিবেশন করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল। দাড়িদা দেখাশুনো করে। মানে, ফাঁকি দেয়। কিরীটী বাবুও ছুটোছুটি করেন, তামাক খাওয়ার কথা মনে থাকে না। মিত্র বোস এণ্ড কোম্পানির কর্মচারিরা আর আপিসে যায় না; রক্ত-রাখীর ছাউনিতে আসে, আর মানুষ-প্রেতরা যাতে দুটি খেয়ে মানুষ থাকতে পারে সেই চেষ্টা করে। মাতাল বিজন দত্ত কি এত মদ খেয়েও তাহ'লে মাতাল হতে পারল না?

হরেন বাবু এলেন পুঁটলি হাতে করে। কি? না, কিশোরীর বিয়ে। ভালো কথা। কিন্তু সুরমার বিয়েও যে হবে। বিজন দত্তর সঙ্গে। কিন্তু বিজন দত্ত যে মাতাল। মনোমোহিনী দেবী বললেন, হোক্ মাতাল। কাজেই সুরমার মাও বললেন, হোক্ মাতাল। বিজন দত্তর পোয়া বারো! অথচ মজার কথা এই, মদ খাওয়ার ফুরসৎই পায় না বিজন দত্ত। খালি মানুষ প্রেতদের পরিবেশন করে।

মধু এলো ছুটতে ছুটতে। বলল, দাদাবাবুর বিয়ে। আমি নাচব।

মনোমোহিনী দেবী বললেন, পালা।

দমল না মধু। আবার ছুটে এলো। তার হাতে একটা হার। অনেক মানুষপ্রেত তখন জড়ো হয়েছে। খেতে বসেছে তারা। তাদের পরিবেশন করতে হবে। এমন সময় মধুর মনে মৌমাছি মাতল।

হারছড়াটা বের করে মধু বলল, এই হার, বুঝলে মা-ঠাকরুণ, এই হার পরিয়ে দাদাবাবুর ছেলেকে, আমার খোকাবাবুকে আমি বেড়াতে নিয়ে যাব। আর চোরে যদি চুরি করে, ফিরেও চাইব না। ছেলের চেয়ে তো আমার হার বড় নয়।

কিশোরী রাঙিয়ে উঠল। বিনোদ গা ঢাকা দিল। তারাকিংকরী একটা পাত্রে তরকারি ঢালতে লাগলেন। দাড়িদার মুখ মৃদু হাসিতে ভরে গেল। কিরীটীবাবু বললেন, ব্যাটার মনে আছে তো ?

সুরমা, সুরমার মা অবাক হয়ে চাইলেন। বিজন দত্তও অবাক হ'ল।

মনোমোহিনী দেবী বললেন, তুই থাম্ মধু।

তা তো বলবেই বাছা, মধু হুল ফুটিয়ে বলল। ছেলেটাকে তো তুমি দুচোখে দেখতেই পারো না। তাই নাতিকে একজন আদর করবে শুনে মুখ গোমড়া করছ।

এতক্ষণে সবাই বুঝল কথাটা। সুরমা ফিক্ করে হেসে ফেলল। সুরমার মাও হাসলেন। মাতাল বিজন দত্ত হো

মধু চটে গেল। বলল, এর মধ্যে হাসির কথাটা কি পেলে বাবু ?

মনোমোহিনী দেবী তর্জন করে উঠলেন, তুই দিন দিন বড় ঝগড়াটে হয়ে উঠছিস্ মধু। এতগুলো লোক বসে আছে। খেতে দিতে হবে না ?

যাই মা-ঠাকরুণ, বলে মধু এগোল।

মানুষপ্রেতরা যাতে মানুষ থাকতে পারে সেই চেষ্টা চলতে লাগল।

মাতাল বিজন দত্ত কি আর মাতাল থাকবে না ?

কিশোরীর মতো সুরমাও যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে মানুষ প্রেতদের পরিবেশন করছে।

রক্ত-রাখী

কর্মীসূচী

প্রকাশ করেছেন	সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল
প্রকাশ কার্যে সাহায্য করেছেন	রতনমোহন দাস
প্রচ্ছদপট এঁকেছেন	লক্ষ্মীনারায়ণ সেনগুপ্ত
ব্লক করেছেন	গস্ আর্ট কটেজের পক্ষে পঞ্চানন ঘোষ